খেলাঘর

শ্রীবলাই প্রামাণিক

৩৭ তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

"অনিত্য এ ধরায় জেনো
কিছুই বড় টিকৃতে নারে,
ভালবাসাই হেথায় শুধু
অমর হয়ে থাকতে পারে।"

—ওমর খৈয়াম

শ্রীবলাই প্রামাণিকের লেখা

অন্য বই

প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন

মেঘ ও রৌদ্র

দুটি কথা

জীবনের খেলাঘরে, হাতের গোড়ায় যাদের খুঁজে পেয়েছি এবং যাদের মনের খবর আমার মনকে জাগিয়ে তুলেছে, আজ তাদের কাহিনী বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে এই উপন্যাসে চিত্রিত হ'ল।

কথা-সাহিত্যের আসরে আমি ঢুকেছিলাম অতি সন্তর্পণে, বিনিময়ে পেয়েছি অনেক কিছু। লেখকের জীবনে এইটুকুই যথেষ্ট, এবং তারই জোরে আজ আমার পথের সম্বল পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিলাম। যশের কামনা করি না, বইখানি পাঠক-সমাজে সমাদর পেলে কৃতার্থ হব—এ কথা অকপটে বলতে পারি।

খেলাঘর

"শান্তি লজে"র বৈঠকখানা। বড় হলঘরের মধ্যস্থলে একটা শ্বেতপাথরের চারপায়া টেবিল, তার ওপর একটা সাদা পাথরের বক হাঁ ক'রে আছে, দু পাশে দুটি বড় কাট-গেলাসের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার ডাঁটী মাথা উঁচু ক'রে আছে। কয়েকখানা কোচ টেবিলের চারিদিকে সাজানো, দূরের কোণে হালকা টুলের ওপর নাম-না-জানা পাতাবাহারের গাছ, চারখানি বিলাতি ছবি, সামনের দেওয়ালে একখানি বড় আয়না, বিপরীত দিকে মানুষ-প্রমাণ একটি ঘড়ি দাঁড়িয়ে টিক টিক শব্দ করছে। পাশের ঘরে নার্সের পায়ের খট খট জুতার শব্দ মাত্র শোনা যাচ্ছে। এটর্নি পালিতবাবু ব'সে আছেন, হাতে কতকগুলো দলিল-পত্র—লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা।

নার্স পালিতবাবুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, বোস সাহেব কখন আসবেন বলতে পারেন ?

পালিতবাবু ব্রিফের পাতা ভাঁজ ক'রে টেবিলের ওপর রেখে নার্সের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আমায় তো

ফোনে বিশেষ ক'রে জানিয়েছেন পাঁচটার সময় আসতে, কি একটা প্রয়োজনীয় কাগজ করতে হবে। কেন এখনও এলেন না বুঝতে পারছি না তো। খুকু কেমন আছে? এখন তুমিই তো তার ভার নিয়েছ? বোসের কাছে শুনলাম।

কি করি বলুন। আমাদের ধর্ম্মই সেবা করা। আর ভার নেওয়ার কথা বলছেন? ভার কে কার নিতে পারে বলুন? উপলক্ষ মাত্র আমরা। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করব ওকে বাঁচাতে—ওর মা মরার অভাব আমি ওকে বুঝতেই দেব না। এটা আমার প্রতিজ্ঞা নয়, আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

বোস সাহেব মেয়েকে বড় ভালবাসেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পরের দিনই আমার কাছে ছুটেছেন।—আমার শান্তির কি হবে পালিত? সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ক'রে ফেললেন বাড়ীর নাম "শান্তি লজ"। এখন বোধ হয় ঐ এক বৎসরের শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ স্থির করবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন।

পাশের ঘরের কান্নার শব্দ শুনে চ'লে গেল নার্স।

ভট্টাচার্য্য তাঁর ভিজে গামছা কাঁধে ফেলে চৈতনের ফুলটা খসিয়ে ফেললেন, গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা ফিরিয়ে নিলেন, হাতের কড়ে হিসাব করতে করতে বোস সাহেবের ফটকে ঢুকলেন, প্রস্তরের নগ্ন নারীমূর্ত্তি আগেই চোখে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে নিলেন, জিভ কাটলেন, ভাবলেন বিলাত-ফেরতের

প্রতিমূর্ত্তি, বিলাতি হাওয়া ছড়িয়ে পড়েছে অন্দরে সদরে চারিদিকে। নিজেকে সিঁটকে ছোট ক'রে প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগলেন, ওই মূর্ত্তিগুলো স্পর্শ না করে যেন তাঁকে। ঘরে ঢুকেও সুস্থির হতে পারলেন না ভট্টাচার্য্য মশাই দেওয়ালের ছবিগুলি দেখে। সীতা-হরণ, কালীয়-দমন, সতীর দেহত্যাগ, রামের বনবাস দেখব, না, তার পরিবর্ত্তে মেম সাহেবের ঢলাঢলি! মাথা হেঁট ক'রে লাঠিতে ভর দিয়ে ব'সে রইলেন ভট্টাচার্য্য মশাই। দেখি, বোস সাহেব এখন কি বলেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম তো তুলেই দিয়েছেন!

জুড়ি ঘোড়ার পায়ের শব্দে আর সহিস-কোচমানের হাঁক-ডাকে ঘুমন্ত দারোয়ান সজাগ হ'ল, ভৃত্য ছুটে এসে দাঁড়াল গাড়ীর সামনে, অপেক্ষায় রইল হুকুমের। পালিতবাবু ঘড়িটা দেখলেন। ভট্টাচার্য্য একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। বোস সাহেব গাড়ী থেকে নেমে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললেন, পালিত, অনেকক্ষণ এসেছ নিশ্চয়? এই যে ভটচাৰ্য্যি মশাই! একটা বিশেষ কাজে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন বোস সাহেব, বললেন, আমার খুকু—শান্তি কেমন আছে মিনা দেবী? কোলে তুলে আদর করলেন শান্তিকে, তোর মাকে হারালি, তোর বাবা এত বড় ডাক্তার হয়েও বাঁচাতে পারলে না তোর মাকে! মিনা দেবী, শান্তি-মার যেন কোন কষ্ট না হয়, শেষে হয়তো ওর বাবাকেও হারাতে হবে অল্পদিনের মধ্যে।

আপনি কি বলছেন ?—মিনা বললে।

কই, না তো, আমার কি মাথার ঠিক আছে!—ব'লে তিনি চ'লে গেলেন তাঁর খাস কামরায়। জামা কাপড় বদলাবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় তাঁর ওষুধের কারখানার ম্যানেজার এসে সামনে দাঁড়াল। তিনি তাঁর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, কিছু দরকার আছে না কি ?

ম্যানেজার একটু হেসে বললেন, আজকের অর্ডারটা সাপ্লাই করতে—

বাধা দিয়ে বোস সাহেব বললেন, আজ থাক্, আমাকে একটু—

ম্যানেজার হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, আজ থাক্, মানে—আপনি একটু রেস্ট নিন। পরে না হয়—

বোস সাহেব বললেন, হ্যাঁ, তাই ভাল। এখন আমার একটা বিশেষ কাজ আছে।

ম্যানেজার চ'লে গেলেন, বেশ খানিকটা সময় কেটে যাবার পর বোস সাহেব হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পালিতের কাছে এসে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল, আমার মাথার ঠিক নেই।

পালিতবাবু বললেন, সব কাজ সেরে আপনার এখানে এসেছি, তাড়ার কিছু নেই।

বোস সাহেব ভট্টাচার্য্য মশাইকে কাছে ডেকে বললেন, এই দেখুন না, সব কি রকম যেন বিস্মরণ হয়ে যাচ্ছে! আমার

ঐ একটি মেয়ে, তার অসুখ—মাথা ঠিক রাখতে পারছি না। বাঁচবে কি, কি হবে তাই বা কে জানে। মিনা দেবী, দুধের সঙ্গে ওষুধটা দিয়েছ তো?

মিনা দেবী বললে, হ্যাঁ, দিয়েছি পাঁচ ফোঁটা ক'রে চারবার।

বোস সাহেব টেবিলের সামনের চেয়ারে ব'সে চাপা গলায় বললেন, কে যেন আমার গলা টিপে ধরছে, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, সর্ব্বদাই মনে হয় এই বুঝি আমার কাজ শেষ হয়ে এল। বিলেত গেলুম উচ্চশিক্ষা লাভ করতে, শিখেও এলাম, কিন্তু কি হ'ল? এক বছরে শান্তি মা-হারা হয়েছে, বাবাকেও হয়তো হারাতে হবে জ্ঞান হবার আগে।

আপনি এত অধীর হবেন না।—ভট্টাচার্য্য বললেন।

ধীর আর আমি হব না। আমায় এই অধীরতা নিয়েই যেতে হবে। হ্যাঁ, কাজের কথাই ভুলে যাচ্ছি। পালিত, তুমি একটা উইল ক'রে দাও। আমার আত্মীয়-স্বজন কেই বা আছে, আর কার হাতেই বা তুলে দেব এই অসহায় শিশুর ভবিষ্যৎ? তাই ঠিক করেছি, বোস-বংশের কুল-পুরোহিত রামহরি ভট্টাচার্য্য মশাই ওর অভিভাবক হয়ে থাকবেন। উনি কি আর আত্মসাৎ করতে পারেন ঐ শিশুর গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি? না না, সে হতে পারে না—তা হতে পারে না।—বার কতক হাত নাড়লেন বোস সাহেব। ওরে, কে আছিস?

এক গেলাস জল নিয়ে আয় তো! এক গেলাস জল এক নিশ্বাসে পান ক'রে বললেন, স্বয়ং ভগবানের হাতে তুলে দিচ্ছি, এতে 'কিন্তু' করবার কিছু নেই। তুমি লেখো পালিত, লেখো।

ভট্টাচার্য্যের বুক কেঁপে উঠল, স্থির চিত্ত অস্থির হয়ে পড়ল, লাঠিতে ভর দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে ভাল ক'রে বসলেন, বোস সাহেবের বিশ্বাস অটুট থাকবে কি না! পাপে লিপ্ত হয়ে না পড়ি শেষ বয়সে!

কাগজ নিয়ে বসলেন পালিতবাবু, বললেন, কি ভাবে উইল তৈরি হবে?

বোস সাহেব এদিক ওদিক দেখে বললেন, লেখো পালিত, লেখো, আমার অবর্ত্তমানে স্থাবর অস্থাবর যা কিছু আছে সমস্ত তত্ত্বাবধান করবেন রামহরি ভট্টাচার্য্য। প্রয়োজনে সর্ব্ব স্বত্ব অর্পিত হবে রামহরি ভট্টাচার্য্যের ওপর। শিশুকন্যার শিক্ষার এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অর্থের প্রয়োজন হ'লে সম্পত্তি বিক্রয় ক'রে অর্থের সংস্থান করতে পারেন। এই বাড়ি, ব্যবসা, ব্যাঙ্কের টাকা, অলঙ্কার ইত্যাদি শান্তির হস্তে অর্পিত হবে একুশ বৎসর অন্তে। বিবাহ দেবার চেষ্টা তিনি যেন না করেন সাবালিকা না হওয়া পর্য্যন্ত।

পালিতবাবু লেখা বন্ধ ক'রে, বোস সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি বললেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, যা বলছি তাই লেখো। বিয়ে? শান্তি বড় হয়ে যা উচিত মনে করবে তাই করবে—সে অধিকার আমারও

নেই, আর ভট্টাচার্য্যেরও নেই। সেটা তার নিজের হাতেই থাক্। যত শীঘ্র পার এটাকে রেজেষ্টারি ক'রে দাও। কখন আছি, কখন নেই!

পালিতবাবু কাগজের বাণ্ডিল বাঁধতে বাঁধতে বললেন, ভট্টাচার্য্য মশাই, আপনি তো কিছু বললেন না উইল সম্বন্ধে? নাবালিকার সমস্ত ভার আপনার ওপর অর্পিত হ'ল। উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইলেন ভট্টাচার্য্যের দিকে।

ভট্টাচার্য্য মশাই একটু ইতস্তত ক'রে ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বললেন, ওঁর ইচ্ছা হয়েছে, আমি কি আর ওঁর ওপর কথা বলতে পারি?

কয়েক দিনের মধ্যেই উইল রেজেষ্টারি হয়ে গেল।

ঘড়ির কাঁটার মত দিনের চাকা ঘুরে গেল। কালের স্রোতে কবে কাকে কি ভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কে কার খবর রাখে! ভট্টাচার্য্য মশাই দিনের আহার শেষ ক'রে সামনের বারান্দায় চেয়ারে ব'সে তামাক টানছেন। মেঘ-ঢাকা রৌদ্রের ছায়ায় মুখে চিন্তার ভাব পরিস্ফুট হ'ল। গৃহিণী রাজলক্ষ্মী মুখে জোড়া পান ভ'রে একটু দোক্তা ফেলে, নথটাতে ঝাঁকানি দিয়ে, দূরের চেয়ারখানা কাছে টেনে নিয়ে

ব'সে বললেন, তুমি আর অমত ক'রো না, একটা ভাল উকিলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের ক্ষমতা বুঝে নিয়ে বাড়ি বিক্রি ক'রে টাকা সংগ্রহ কর। দুই মেয়ে যুগ্যি হয়েছে, আশেপাশের লোকেরা যা-তা কথা বলে, কান পাতা যায় না। বামুনের ঘরের মেয়ে আর কতদিন এভাবে রাখা যায়? আমার বিয়ে হয়েছে আট বছর বয়সে, বিয়ের কথা শুনছি ছ বছর বয়স থেকে। মেয়েদের মুখ দেখলে ভাত নাবে না গলা দিয়ে। তিন-তিনটে মেয়ে পার করবে কি ক'রে শুনি? বিনা পণে তো আর তোমার মেয়ে বিকোবে না। সেই যে বের হ'ল, আর কোন খবরই পাওয়া গেল না তিন বছরের মধ্যে। তুমিই তো বলেছ ওর সব ভার তোমায় দিয়ে গেছে। বলে—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। হুঁ।

হুঁকায় গুড় গুড় শব্দ ছাড়া আর কোন জবাব এল না ওদিক থেকে।

শান্তি হাতে একখানা ছেঁড়া বই নিয়ে এসে রামহরিকে বললে, বাবা, বাবা, আমার বইখানা ছিঁড়ে গেছে, একখানা বই কিনে দেবে? আর পারুলের মত একটা জামা দিও বাবা। ব'লে ভট্টাচার্য্যকে জড়িয়ে ধরলে। চেয়ে রইল মুখের দিকে উত্তরের অপেক্ষায়।

রাজলক্ষ্মী উঠে গিয়ে কর্ত্তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কাংসকণ্ঠ ঝনঝনিয়ে বললেন, এই না সে দিন ছোড়দা বই

কিনে দিলে ? আবার বই চাই ? তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে না, দূর হয়ে যা।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শান্তি, বাধা মানল না চোখের জল, 'বাবা' 'বাবা' বলে কাঁদতে লাগল কাতর স্বরে। ছোটদা হাত ধ'রে বার বার জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ? বাপের পাশে বসিয়ে দেয় শান্তিকে। চোখ মুছিয়ে দিলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে।

তোমার মা কি বলছেন শুনছ ?—ভট্টাচার্য্য বললেন বিনয়কে।

রাজলক্ষ্মী পানের ডিবে থেকে এক জোড়া পান বের ক'রে মুখে ফেলে একটু চড়া সুরে বললেন, এতে আর 'কিন্তু'র কি আছে ? তিন বছরে তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, জলে ডুবল কি সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে গেল—কিছুই জানতে পারলাম না। শান্তিকে কর্ত্তার পাশ থেকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে দিলেন, বললেন, তুমি কি শুনছ ? যাও না, খেলা করগে না। ঐ জড় একটু রেখে গেছে, ওর বিয়ে হ'লে সে আবার কৈফিয়ৎ চেয়ে না বসে। তার জন্যেই কাঞ্চনকে উকিল-বাড়ি পাঠিয়েছি।

ভট্টাচার্য্য মশাই চমকে উঠলেন রাজলক্ষ্মীর কথা শুনে। তিনি আর্ত্তস্বরে বললেন, তোমরা এ সব কি করছ? একটা অসহায় নাবালক শিশুর সর্ব্বনাশ করতে একটু দ্বিধা হচ্ছে না? আমাকে ডুবিয়ে মারছ পাপের গহ্বরে? এত পাপ সইবে না—কিছুতেই না, ভগবান আমায় ক্ষমা করবেন না। শান্তি—শান্তি—ক'রে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন শান্তিকে—আমার কেমন ভয় করে তোকে দেখতে না পেলে। বারে বারে কেঁপে ওঠে বুকটা।

কে? কে ডাকছেন? ভিতরে আসুন।—রাজলক্ষ্মী বললে।

ঘটক মশাই অভ্যাসমত কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকলেন। খালি পা, খাটো ধুতি, লম্বা ঝুলের শার্ট জামা গায়ে। এক বগলে গামছা-জড়ানো ছাতা একটা, আর এক বগলে কয়েকখানা বই খাতা, একখানা পঞ্জিকা—কখন কোন্‌টা কি কাজে লাগে কে বলতে পারে? ছোট একটি ঘড়িও পকেটে আছে। সময় ধ'রে পঞ্জিকার পাতা উল্টে ভাগ্য গণনা করতে হয় ঘটকের। নরগণ আর রাক্ষসগণের মিলন ওদের দ্বারাই সম্ভব হয়। শুভাশুভ সব কিছু নির্ভর করে এই ঘটকের ওপর। দরকার হ'লে আঁচিলকে জড়ুল আর তিলকে তাল করতে ওরাই পারে। ঘটকের মুখেই বর-কনের রোগের ওষুধ নির্ব্বাচন হয়।

রাজলক্ষ্মী চেয়ারখানা টেনে নিলেন ঘটকের কাছ পানে, বললেন, আমার রমিলার কি করলেন? পাত্র কেমন?

লেখাপড়া কতদূর শিখেছে? স্বাস্থ্য কেমন? পণই বা কি দিতে হবে? জমি-জমা ঘর-বাড়ি আছে কি? ননদ-টনদ নেই তো?

ঘটক আমতা আমতা ক'রে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, এতগুলো কথার জবাব এক সঙ্গে দিতে পারব না। হ্যাঁ, আছে—আছে।

কি আছে? ননদ থাকলে ওখানে রমিলার বিয়ে দেব না, গায়ের রক্ত শুষে খাবে তারা।

না, নেই, নেই তো।

তাই বলুন।—রাজলক্ষ্মী বললেন।

দুটো পাত্র ঠিক করেছি, একটা আমি আর একটা উনি। সুন্দরী বামনীর বাড়ি নোখ কাটতে যেতে হয় তো তাকে, কথায় কথায় ঠিক করেছে। প্রমিলার বর সুন্দরী বামনীর ছেলে ভালই হবে। রমিলার পাত্র আমিই ঠিক করেছি। লেখা-পড়া বেশ ভালই জানে, কটা নাকি পাস করেছে বিমল।

আর বড় জামাই?—রাজলক্ষ্মী বললেন।

ঘটক বললে, জমি-জমা ঘর-বাড়ি সবই আছে—কলকাতায় নাই বা হ'ল। স্বাস্থ্য ভাল, কাজকর্ম্ম দরকার হয় না, করে না, এইবার করবে—করবে—নিশ্চয়ই করবে। কি জানেন, চাপ পড়লেই বাপ বলে, বিয়ে করলে চাকরি করতে হবে বই কি।

থাক্, আর বলতে হবে না। আসল কথাটা বলুন তো?

দেনা-পাওনা কি রকম? কুশী কোথা গেল, ডেকে ডেকে সাড়া পাই না, বকতে বকতে যে পানের ডাবা শেষ হয়ে গেল, ওপর থেকে গোটা কয়েক পান আন্ তো।

ঘটক একবার গোঁফ জোড়াটা পাকিয়ে, এদিক ওদিক দেখে বললে, ভট্টাচার্য্য মশাই, এটি? শান্তিকে দেখিয়ে বললে।

ভট্টাচার্য্য একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, এটি আমার ছোট মেয়ে শান্তি।

ঘটক আদর ক'রে কাছে টেনে নিয়ে বললে, কি রকম বর চাই বল? বিলেত-ফেরত ডাক্তার? না, ব্যারিস্টার? না, সিনেমার এক্টর? যেমনটি বলবে এনে দেব। হাতের খাতাগুলো দেখিয়ে বললে, এই পুঁথির মধ্যে সব আছে।

রাজলক্ষ্মী উঠে গিয়ে কণ্ঠে দরদ দিয়ে বললেন, এখন যাও তো মা। পণ কি চাই তাই বলুন?

বিশেষ কিছু নয়। ভাল ঘর ভালই চায়, বড় জামাই—আশি ভরি গয়না, আর নগদ মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা আর আপনাদের বাড়ির জামাই যে খালি হাতে ফিরবে না তা তারা জানে, বিশেষ ক'রে আপনাদের অবস্থা যখন—

তার মানে? কি বলছেন আপনি?—ভট্টাচার্য্য বললেন।

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, এ তল্লাটে এ কথা কে আর না জানে? আর আপনার অভাব কি? মেয়ে-জামাইকে দিতে সাধ কার না হয়! অভ্যাসমত কাশতে থাকে ঘটক।

সে কথা চাপা দিয়ে রাজলক্ষ্মী বললেন, আমার প্রমিলার কি করলেন? একই লগ্নে হবে তো?

হবে বইকি, হবে, নিশ্চয়ই হবে, একই লগ্নে, বলেছি তো—গিন্নি ঠিক করেছে, নোখ কাটতে তো তাকেই যেতে হয় সুন্দরী বামনীর বাড়ি। গিন্নি আমার বোবা ছেলের বোল ফুটিয়ে চালিয়ে দিতে পারে। কালোকে ধলো করা আর বেশী কথা কি! ছেলের বাপ নেই, মা আছে, দেশে কাঁচা-পাকা ভিটেও একটু আছে। পাড়ার লোকে সুধাকণ্ঠি ব'লে ডাকে। গ্রামের নতুন খবর তো আগে সেই ছড়িয়ে বেড়ায় ঘাটে মাঠে। বিমল ছেলে সোনার টুকরো, সাত চড়ে রা বের হয় না। খাওয়া পরার অভাব হবে না ওখানে। গিন্নিকে বলেছেন, বড় মেয়েকে তো দিচ্ছেন, এক হাটে তো আর দু দর হয় না।

রাজলক্ষ্মী বললেন, শুনলে তো সব কথা, এখন ঘটক মশাইকে যা হয় একটা উত্তর দাও।

ভট্টাচার্য্য বললেন, এত টাকা কি ক'রে সংগ্রহ হবে?

সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, এখন কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হই, তারপর—। তুমি কি শুনছ শান্তি, যাও না তোমার ছোড়দার কাছে।

ভট্টাচার্য্য একটু চিন্তা ক'রে বললেন, ঘটক মশাই, আপনি কালকে আসবেন, জবাব দেব।

ঘটক চ'লে গেলে ভট্টাচার্য্য বললেন, তোমরা যে কি

করছ আর কি করতে চাইছ জানি না, তবে জেনে রাখো—ভগবান এ অপরাধে ক্ষমা আমায় কিছুতেই করবেন না। বোস সাহেব তাঁর কুলপুরোহিতের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ। এক তুলাও সন্দেহ করেন নি শান্তির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। কাগজপত্র টাকাকড়ি আমার এই হাতে তুলে দিলেন, বললেন, বাপ-মা-হারা শিশুর গচ্ছিত ধন সজাগ হয়ে বুকে ক'রে রাখবেন। জড়োয়ার গয়নাগুলো আঁচল ভ'রে নিয়ে এলাম তোমার কাছে। মনে ক'রে দেখ দেখি, কটা চাবি মেরে রেখেছ হাত ক'রে। তার মায়ের গয়না এক তোলাও তার গায়ে উঠল না আজ পর্য্যন্ত। বাপের দেওয়া মায়ের কাপড় একখানিও অঙ্গে স্পর্শ করল না।

পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলেন রাজলক্ষ্মী, বললেন, কাঞ্চন ফিরেছে। কি খবর হয় দেখি।—ব'লে উঠে গেলেন।

কাঞ্চন গায়ের কোটটা চেয়ারের ঠেসের ওপর রাখলে, গলার টাই ধ'রে টানাটানি করতে করতে বললে, এক গেলাস জল।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বললেন, শুধু জল খাবি কি রে? পেট ম'রে আছে, খালি পেটে জল খেলে অসুখ করবে। কাজের কি বিরাম আছে! এত বড় তেল কোম্পানির বড়বাবুর কাজ, কত মাথার খাটনি, তা কুলি-মজুররা জানবে কি ক'রে! তারা দেখছে পাখার তলায় ব'সে ঠাণ্ডা জল খেতে। তেল কোম্পানির বড়বাবুর কি কাজ তারা বুঝবে কি? শান্তি! কোথায় গেল শান্তি? ওরে কুশী, খোকার জন্যে একটু চা জলখাবার নিয়ে আয়। একজোড়া পান মুখে দিয়ে রেগুলেটারের চাকাটা ঘুরিয়ে দিয়ে রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কতদূর কি করলি বাবা?

পা দুটো টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে কাঞ্চন বললে, উকিল এটর্নির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখলাম,—এখন সঙ্গে সঙ্গে কিছু করা চলবে না, ভবিষ্যতে বিপদ আছে।

তবে কি হবে কাঞ্চন? মেয়ে পার হবে কি ক'রে? ঘটক মশাই সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন, মেয়ে বড় হয়েছে। মেয়েছেলের বাড় নয় তো বরষার কলাগাছ—তাকাতে পারা যায় না মুখের দিকে। ঘটক মশাই অনেক চেষ্টা ক'রেও প্রমীলার কোথাও ঠিক করতে পারেন নি ওর ঐ কালো রঙ আর খাটো চুলের জন্যে। ওর স্ত্রী প্রমীলার পাত্র ঠিক করেছে। দেনা-পাওনা আমাদের ওপর ভার দিয়েছেন। শুনেছেন কার কাছে, একসঙ্গে দুই মেয়ের বিয়ে হচ্ছে—কম বেশী করতে পারে? বিশেষ ক'রে কর্ত্তার নাম ক'রে বলেছে।

আমার এখন বসবার সময় নেই। ধূমায়িত কাপে চুমুক দিয়ে কাঞ্চন বললে, সিনেমার টিকিট কেনা আছে। বর্ম্মা আফিসের বড়বাবুর ওয়াইফকে বাংলা ছবি দেখাতে হবে। ব'লে হাতের ঘড়িটা দেখলে।

বিনয় শান্তিকে সঙ্গে ক'রে ঘরে ঢুকে কাঞ্চনকে বললে, বড়দা, শান্তিকে কাল স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছি, ভাল দিন আছে, আর বড়ও তো হয়েছে, যা পারে শিখুক না।

রাজলক্ষ্মী গোড়া বেঁধে, জোড়া পান মুখে দিয়ে বললেন, এত ব্যস্ত কিসের? যা হয় একটু ঢেঁড়াটা ফোঁটাটা টানবার মত পরে শিখলেই হবে। মেয়েছেলে হাঁড়ি ঠেলবে, না হয় বাসন মাজবে, নেতা-কানি কাচতে কাচতে প্রাণ যাবে।

বড়দিকে মেজদিকে শেখালে কেন?

রাজলক্ষ্মী রক্ত চক্ষু দেখিয়ে বললেন, এর উত্তর কি তোমায় দিতে হবে? এই যে আমি নেকাপড়া শিখি নি, সংসার চলছে কি না? কেউ এক পয়সা ঠকিয়ে নিক দিকিনি—গণ্ডায় গণ্ডায় হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে আমাকে। নাক টাকা নাক টাকা, দু কুড়ি দশ টাকা, বাকি থাকে এক টাকা, আমার হিসাবের ভুল ধরুক দিকিনি কেউ।

কাঞ্চন বললে, তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে পারুলদের ওখানেই ভর্ত্তি ক'রে দাও, এক সঙ্গে যাবে আসবে।

কাজের কথা তো বললি না খোকা?

কাঞ্চন এদিক ওদিক দেখে মাকে বসতে ব'লে বললে, ওর সম্পত্তি নিতে হ'লে আর তা থেকে নিজেদের বাঁচাতে হ'লে আগে থেকে একটু আটঘাট বেঁধে চলতে হবে। এটর্নি-বাবু বললেন, কর্পোরেশনের ট্যাক্স বাকি ফেলে, বাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে মেরামত করতে হবে, শান্তির খোরপোষ বা যে ভাবেই হোক লোন দেখাতে হবে।

ভয়ে শিউরে উঠে কম্পিত ভাবে রাজলক্ষ্মী বললেন, লোন কি বাবা? উত্তরের অপেক্ষায় থাকেন রাজলক্ষ্মী।

ধার—ধার—দেনা দেখাতে হবে। দু-এক বছর পরে বিক্রি করতে পারবে। তা না হ'লে ভবিষ্যতে ওর যে স্বামী হবে, দাবী-দাওয়া করলে বিপদ আছে।

তবে কি হবে খোকা?

অপেক্ষা করতে হবে, উপায় কি! তুমি এখন থেকে বাবাকে ঠিক ক'রে রাখ—সই তো তাঁকেই করতে হবে। পকেট থেকে একটা সাদা কাগজ বের ক'রে দিয়ে মাকে বললে, এতে এই ঢেঁড়া চিহ্নটার পাশে একটা সই করিয়ে নেবে, আমি পরে নিয়ে যাব। এটা করলে হবে কি, ধার দেখিয়ে জজের হুকুম নিয়ে বেচতে পারব।

এতে কি উনি রাজী হবেন?

রাজী না হন, হাতে শিকল পড়বে।—ব'লে হাতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে কাঞ্চন।—গয়নাগুলো ঠিক রেখো, বাবা আবার স্নেহ দেখিয়ে শান্তির গায়ে চড়িয়ে না দেন!

একটু চাপা হাসি হেসে চাবির তাড়াটা দেখিয়ে রাজলক্ষ্মী বললেন, সেদিকে আমি শক্ত আছি, সাতটা চাবির ভেতর রেখেছি। পাবে কোথায়? নির্ম্মলকে ভয় করে—কোন্ সময় হাত দিয়ে না ফেলে। তাই তোলা শাড়ীর পেঁটরায় কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি।

কাঞ্চন দু পা গিয়ে ফিরে এসে বললে, আর একটা কাজ আছে।

কি কাজ তাই বল?

বোস সাহেবের আর তাঁর গৃহিণীর বড় বড় ছবিগুলো সামনে থেকে একেবারে সরাতে হবে, আর ছোট ছবি বা কোন ডাইরী বই কাগজ-পত্র যা আছে আপাতত চাবির মধ্যে বন্দী করতে হবে।

রাজলক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে একটু ফিকে হাসি হেসে বললেন, খোকার কি একটা কাজ! কতদিকে কত রকম আটঘাট বেঁধে চলতে হয়! মাথার খাটনি কত, ঠাণ্ডা জল আর অফুরন্ত পাখার হাওয়া না পেলে সামলাবে কি ক'রে?

শান্তি পরীক্ষার ফলের কাগজটা হাতে ক'রে উৎফুল্ল মনে বাড়ি ফিরেছে। ছুটে এসে মায়ের হাতে দিলে কাগজ-

খানা আর বললে, দিদিমণি বলেছেন একটা ভাল প্রাইজ দেবেন আমাকে। পারুলকে দেবেন না, ও কিছু পারে নি। আরও কি সব বললেন দিদিমণি।

পারুল মুখ ভার ক'রে খাটো গলায় বললে, জান মা, দিদিমণি আমায় দেখতে পারে না, মাঝে মাঝে বলেন—বামুনের ঘরে গরু জন্মেছে। আবার বলেন—শীতের কাঁথা। শীতের কাঁথা কি মা?

রাজলক্ষ্মীর অন্তরে ঘা দিয়ে কথা ব'লে গেছে ও-পাড়ার নেচোর মা—শান্তিকে তো আগে দেখি নি দিদি, যজমান-বাড়িতে হয়েছে বুঝি? বেশী জ্বালা করছে শান্তির রূপের বাখানি শুনে। রমিলা-প্রমীলাকেও ঘাঁটতে বাকি রাখে নি, তাদের যৌবনের মত্ততা দেখে। একটু স'রে গিয়ে পারুলকে বললেন, বামুন-দিদির কাছ থেকে দুধের সরটা চেয়ে নিয়ে খেও।

বিনয় গায়ের জামাটা ছুঁড়ে ফেললে বিছানার ওপর, শান্তিকে কাঁদতে দেখে বললে, কি হ'ল রে শান্তি?

শান্তি ভয়ে ভয়ে ধরা গলায় চোখ মুছতে মুছতে বললে, পারুল পরীক্ষায় পাস করতে পারে নি, তা আমি কি করব?

বিনয় সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললে, না না, কাঁদবার কি আছে?

রাজলক্ষ্মী গালভর্ত্তি পান চিবুতে চিবুতে বললেন, তোমার

বড়দা ডাকছে, পাশের ঘরে তাকে ভাল ক'রে পরীক্ষার ফলাফল বুঝিয়ে দাও।

কাঞ্চন চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললে, শান্তি, পারুল, দেখি কেমন পরীক্ষা দিলে! পারুল, তুমি শ্বশুর বাড়ী গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবে! আর শান্তি? মুখের দিকে চাইলে কাঞ্চন, তুমি বিলেত গিয়ে বড় ডাক্তার হয়ে আসবে।

পারুল বললে, কেন বড়দা, আমি হাঁড়ি ঠেলব?

না না, ও এমনি গল্প কথা। শান্তি, দেখি তোর হাতের লেখা কেমন?

একটা কাগজে লিখলে শান্তি—যা চায় তা পায় না, যা পায় তা চায় না।

এ কথা কে শেখালে তোকে?

শান্তি বললে, ইস্কুলের দিদিমণি, আর বলেছে থিয়েটারে বুড়ো সাজতে হবে। আমি যে ছেলেমানুষ, কি ক'রে বুড়ো হব দাদা?

কাঞ্চন বললে, দাড়ি-গোঁফ দিয়ে সাত বছরের শান্তিকে সত্তর বছরের বুড়ো ক'রে দেবে। পকেট থেকে একটা লেখা কাগজ বের ক'রে বললে, নাম লিখতে পার?

হ্যাঁ, স্কুলে লিখি তো।

এইখানে একটা নাম লেখো দেখি? হাতের গোড়ায় এগিয়ে দিলে কাগজটা, শান্তি লিখতে লাগল ধীরে ধীরে।

পারুল লিখবে না দাদা?

ওর হাতের লেখা ভাল নয়।—ব'লে কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পকেটে রাখলে কাঞ্চন।

রাজলক্ষ্মী বললেন, কাঞ্চন, এবার একটা বিহিত কর, রমিলা-প্রমীলার বিয়েটা হয়ে যাক, তারা আর কতদিন ছেলে ধ'রে রাখবে বল? ভাল পাওনা-থোওনা আছে ব'লে এতদিন আটকে রেখেছে। ঘটক মশাই এলে ওঁকে দিয়ে সায় দিয়ে দেব।

ব্যবস্থা তো সব হয়ে আছে, এখন শেষটা তোমায় করতে হবে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, তোদের মত হ'লে কি আর উনি অমত করবেন? আর উপায়ই বা কি?

কাঞ্চন বেরিয়ে গেল, নির্ম্মল ঘরে ঢুকল।

নির্ম্মল বললে, মা, দশটা টাকা দাও, আমাদের ক্লাবের অভিনয় হবে, তার চাঁদা দিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী বিরক্ত হয়ে বললেন, কর্ত্তাকে গোপন ক'রে আর কতদিন চালাব? কাজকর্ম্ম যা হয় একটা কর্, বড়দা বড় তেল কোম্পানির ম্যানেজার, ছোট ভাই সেও একটা যা হয় করছে, তুই একটা কিছু কর্।

কি করব তাই ভাবছি। অফিসে চাকরি করবার মত বিদ্যে তো আমার নেই।—নির্ম্মল বললে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, না হয় বাপের যজমান রক্ষে কর্। পর দিয়ে পূজো করিয়ে যজমান রক্ষে করলে ঘরে আসবে

কি? এই আকালের বাজারে চাল-কলা সব নিয়ে যাচ্ছে বিনোদ ঠাকুর। পাঁচ টাকা নগদ দিতে হয় মাসে মাসে।

নির্ম্মল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললে, একটা যা হয় করতে হবে, পূজো তো আর করতে পারব না।

পারবি না কেন, শুনি?

মন্তর-টন্তর জানা চাই, তবে তো পূজো হবে।

ইকড়ি মিকড়ি হং বং করতে পারবি না?—রাজলক্ষ্মী বললেন।

তা পারব। ভয় করে—

রাজলক্ষ্মী বললেন, পূজাপার্ব্বণ এসব মেয়েদের ব্যাপার, তারা তো সব বোঝে না যে তুমি কি মন্তর বলছ, কি গিনি সোনায় পিতল মিশ করছ।

নির্ম্মল বললে, তাই হবে। দশ টাকা না দিলে অভিনয় করতে দেবে না, রাজার সিংহাসন থেকে নামিয়ে দরোয়ানের টুলে বসিয়ে দেবে।

এই নাও টাকা।—ব'লে দশ টাকার একখানা নোট ফেলে দিলেন রাজলক্ষ্মী, আর বললেন, কাল থেকে ও পোষাক ছেড়ে ধুতি চাদর পর, তিলক ফোঁটা কেটে, গলায় মালা দিয়ে জাত ব্যবসা কর। কুশী, কোথায় গেলি? কুশী! পারুলের শাস্তির খাবারটা স্কুলে দিয়ে আয়—বেলা হয়েছে।

কুশী ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল, তাহার রূপ-গুণ কিছু বলতে হয়, কিন্তু আজকাল রূপ বর্ণনার বাজার নরম আর

গুণ বর্ণনা হাল আইনে আপনার ভিন্ন পরের করতে নেই। ধোপদোরস্ত থান কাপড়ের সঙ্গে গায়ের রঙ মিশে আছে। কাপড়ের ডগায় এক থোকা চাবি বাঁধা, গলার হার ঝক-ঝক করছে, লক্ষ্য করলেই নজরে পড়ে। পানের ছোপ এখনও মেলায় নি ঠোঁট থেকে। চুলের কোঁকড়ানো ভাব একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদী-বিশেষ বললে হয়। আবার আলপনা, খয়েরের গয়না, ফুলের খেলনা, সূচের কাজে তুলনা রহিত। চুল বাঁধতে, কন্যা সাজাতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন। তার কেউ সহায় নেই ব'লে ভট্টাচার্য্য-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, এই নাও, ওদের খাবারটা স্কুলে দিয়ে এস।

স্কুলের দরজায় ব'সে থাকে কুশী। কত বামুন চাকর নজর ঢেলে দেয় কুশীর ওপর। টানাটানি ক'রে আঁচল ধ'রে নিজেকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে সে।

একটা ফোঁটা-তিলক কাটা উড়িয়া বামুন কুশীর কাছে এসে বললে, ছুটি হতে কত দেরী আছে?

মুখ সিঁটকে স'রে বসে কুশী। বামুনপাড়ার শীতলা-

মন্দিরের পুজোর ঘণ্টা নয়, স্কুলের পেটা-ঘড়ির আওয়াজ ভেসে আসে কানে দূর থেকে। উঠে দাঁড়ায় কুশী। ছুটে আসে মেয়ের দল রঙ-বেরঙের শাড়ী আর ফ্রক প'রে। কেউ খায় আর কেউ চেয়ে থাকে, লজ্জায় স'রে পড়ে সেখান থেকে।

পারুল শান্তি ছুটে আসে কুশীর কাছে, হাত বাড়িয়ে দেয় কুশী। পারুল খাবার খায় আর গেলাস ভর্ত্তি দুধ, জলের বদলে। শান্তি তার খাবারটা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে দুধে চুমুক দিতে দিতে মুখটা বিকৃত ক'রে বললে, ম্যাগো, কি দুধ! কি বিচ্ছিরি দুধ—না ভাই পারুল?

পারুল কোন উত্তর না দিয়ে ছুটল সেখান থেকে।

রামহরি ভট্টাচার্য্য মশাই স্ত্রীর তাড়না থেকে মুক্তি পেয়েছেন। শান্তির ভূ-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। রমিলার প্রমীলার বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হ'লেও শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি বাসা বেঁধেছে দেহের মধ্যে। বোস সাহেবের "শান্তি লজ" আজ লোহা-ওয়ালার লোহার কারখানা হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী পানভরা মুখে একটিপ দোক্তা ফেলে

ভট্টাচার্য্যের পাশে ব'সে বললেন, আচ্ছা, তুমি এত কি ভাবছ বল তো ? মেয়ে দুটোর ভাল ঘর-বর হ'ল—আমাদের দেখেই আনন্দ। প্রমীলার শ্বশুর কোন্ ব্যাঙ্কের বড়বাবু। আর জামাই! দরকার হয় না কাজ করে না। জমিজমা কত! বেয়ান বলেন, ছেলে আমার হীরের টুকরো। প্রমীলার কথা ভাবছ ?

তোমার অন্দরে কাজ থাকে তো যাও।

আমি সব কাজ সেরে এসেছি। মেয়েটার ছ মাস কোন খবর পাই নি। পাশের বাড়িতে নেচোর মাকে কে ব'লে গেছে—প্রমীলা নাকি স্বামীর ঘর করতে পায় না, ছেলের স্বাস্থ্যের হানি হবে। কেউ বলে—মেয়ে পচ্ছন্দ হয় নি, বিমল আবার বিয়ে করবে। বিনয়কে একবার পাঠাব মনে করছি। তুমি কি বল ?

ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন, আমায় আর কেন ? যা ভাল বোঝ তাই কর। যে কাজ করলাম তার অপরাধ অপরিসীম। একটা অসহায় নাবালিকার সর্ব্বস্ব গ্রাস করলে! এই চিন্তায় আমায় কাতর করেছে। তেতাল্লিশ বৎসর ঘর ক'রেও তোমার স্বরূপ চিনতে পারলাম না—

রাজলক্ষ্মী বললেন, তুমি এত কাতর হ'য়ো না। শান্তি আমাদের মেয়ে, সে আমাদের ঘরেই থাকবে।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—ভট্টাচার্য্য মশাই আছেন ? ভট্টাচার্য্য মশাই!

আসুন। বসতে চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, বললেন, কি খবর ?

বিরিঞ্চিবাবু চেয়ারে ব'সে বললেন, আমার ললিতার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, আপনি একটা দিন ঠিক ক'রে দিন এই মাসে।

ভট্টাচার্য্য বললেন, এ মাসে কি ক'রে হ'তে পারে, এ মাসটা মলমাস, তা ছাড়া—

কোন উপায় নেই দূরে সরাবার, আমার গিন্নি নাকি কষে-মেজে দেখেছে আর দেরি করা শোভন হবে না, লৌকিকতা ক্ষুণ্ণ হ'লে ক্ষতি নেই, বিবাহের পূর্ণাঙ্গ সমাপ্ত হয়ে গেছে ললিতার। ক্ষণেকের ভুলে যা ঘটে তা সারা জীবন আহুতি দিয়েও সংশোধন হয় না সে ভুল। সে পথ বেছে নিয়েছে—অনুতাপ সে করবে না, ভবিষ্যতে না খেতে পেলেও। দোষ দেবে না পিতা মাতার। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে সে নিজেকে।

ভট্টাচার্য্য বললেন, যদি একান্ত মত হয়ে থাকে, দেরি করা সম্ভব না হয়, গোধূলি লগ্নে বিয়ে দাও। কাঁকর বেছে ভাত খাওয়া যায় না—কিছু না কিছু থেকেই যাবে। দুই-একটি শ্লোক ছড়িয়ে দিলেন ভট্টাচার্য্য মশাই। এখন তো বিবাহের মহাস্থান হচ্ছে কালীঘাট, সেইখানে পাঠিয়ে দাও, যাগ-যজ্ঞ দিন তারিখ সময় অসময় সাক্ষী সাবুত—কিছুরই প্রয়োজন নেই। এ ভাবে বিবাহের ব্যবস্থা রামহরি ভট্টাচার্য্য দেবে না।

শান্তি ছুটে আসে বাপের কাছে।

কি হয়েছে মা?

বিরিঞ্চিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এটি কে ভট্টাচার্য্য মশাই? আগে তো দেখি নি!

এটি আমার ছোট মেয়ে—শান্তি।

বিরিঞ্চিবাবু চাউনিতেই উত্তরটা শেষ করলেন, কি যেন সন্দেহের ইঙ্গিত স্পষ্ট বোঝা গেল। "আচ্ছা" ব'লে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

ছোড়দার সাহায্যে আর নিজের দুর্ব্বল মনকে সবল ক'রে সাহসে ভর দিয়ে, সাইকেল সাঁতার লাফালাফি সব-কিছু আজ আয়ত্তে এনেছে শান্তি। সাহস ও শক্তি বেড়েছে তার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। স্কুলের থিয়েটারের সমস্যার সমাধান তো সেই করে। রাজা সেজে হোক আর কাবলীওয়ালা, উড়িয়া বামুন, ভিখারিণী পর্য্যন্ত কিছুতেই অপটু নয় সে। সরস্বতীর প্রতিমা সেই তো গড়েছে এ বৎসরে। স্কুলের মেয়েরা মাটির তাল আর রঙের বাটি যুগিয়ে দিয়েছে হাতে হাতে। চুলের গোছা আর সাজ-পোষাক সব-কিছু সে নিজেই করেছে।

বিনয় গর্ব্ব অনুভব করে শান্তিকে পাশে রেখে। খেলার মাঠে, সিনেমা, থিয়েটার কিছুই বাদ পড়ে না তার। মায়ের

কাছে শাস্তির প্রশংসা করে। ভাল লাগে না রাজলক্ষ্মীর, ব'লেও ফেলেন—লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ।

নির্ম্মল শুদ্ধ বস্ত্র, সাদা চাদর, কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা, পাতলা কয়েক গাছা চুলে গাঁদা ফুলের পাতা বাঁধা, খালি পা, দৃষ্টির সমতা হারিয়ে রূপা নামে একটা হিন্দুস্থানী চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে নির্ম্মল বাড়ি ফিরছে। পায়ের গতিবিধি এলোমেলো। সুরার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরখানায়। রামহরি ভট্টাচার্য্যের উঁচু মাথা নীচু ক'রে দেয় আপন ব্যবহারে।

ধরা গলায় টানা সুরে নির্ম্মল বললে, তোম্ কাহে হিঁয়া লে আয়া? বোলা তো হ্যায় বকশিশ মিলেগা। এই, কে আছিস? রাধা কোথায় গেল? আমার রাধা?

বিনয় কর্কশ স্বরে বললে, তোম্ কাঁহাসে লে আয়া?

রূপা নির্ম্মলকে বসিয়ে দিয়ে বললে, রাধাকা ঘরসে, বিবি হামকো পৌঁছায় দেনে বোলা। রুপিয়া পাশমে থা নেই, রাধাকিশানজীকা গহনা চুরি করকে লেগিয়া—

কাকে কি বলছিস তা জানিস?—মারতে উদ্যত হ'ল বিনয়।

দেখুন না বাবু—ঝুটা কি সাচ্চা, কাপড়া মে আবি তো

হ্যায়। বিবি বোলা হ্যায়—ঘরকা বাবুলোককো সমঝায় দেগা। কাপড়ের কোণ খুলে দেখিয়ে দিলে রূপা। রাধাকৃষ্ণের সমূহ অলঙ্কার, দূর থেকে দেখে রাজলক্ষ্মী শিউরে উঠলেন, এ যে দত্ত-বাড়ির শ্যামসুন্দরের অলঙ্কার, নির্ম্মল পূজো করতে গিয়ে চুরি ক'রে এনেছে!

রূপা রাধারাণীর শাড়ী খুলে এক এক ক'রে দেখিয়ে দিলে শ্যামজীকা চূড়, হাতের বালা, গলার পদক, হাতের বাঁশী, আর রাধারাণীর মুকুট, গলার সাতনরি হার, গলার চিক, হাতের চুড়ি, সোনার নোয়াগাছা পর্য্যন্ত আনতে ভুল করে নি নির্ম্মল। পরনের শাড়ীখানায় গহনা বেঁধে এনেছে সে।

বুঝ লিজিয়ে মাজি, ছোটা বাবু—আমায় মা বোলা হ্যায়—বাবুলোককো সমঝায় দেগা।

বাঁকা সুরে নির্ম্মল বললে, এই সাধু বাবা, শোন না গোপাল। তুমি চাও না আমায়? রাধা, কোথা স'রে পড়লে বাবা—

বিনয় ধমক দিলে দাদাকে, ধরাধরি ক'রে কলের নীচে বসিয়ে বালতি কতক জল ঢাললে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মত, শান্তি ছুটে গিয়ে খবর দেয় ভট্টাচার্য্য মশাইকে। নির্ম্মলদা দত্তবাড়ির দেবালয়ে

দেবসেবা দিতে গিয়ে যুগলমূর্ত্তির সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করেছে। শ্রীরাধার আবরণ ছিনিয়ে নিতে অন্তর-আত্মা শিউরে ওঠে নি। এ কাজ কি ক'রে করলে বাবা?—ব'লে দাড়িতে নাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে দেয় শাস্তি। ভট্টাচার্য্য মশাই শুয়ে পড়লেন বিছানার ওপর, ঘৃণায় লজ্জায় অপবাদে উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেল। কুলপুরোহিতের নামের মর্য্যাদা হারাল তার বংশধর।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক কি খোঁজাখুঁজি করলেন আর বললেন, ছেলেটাকে কে কি খাইয়ে দিয়েছে!

আর রাধাকৃষ্ণের গহনাগুলো?—ভটাচার্য্য বললেন।

রাজলক্ষ্মী চোখে চোখ রেখে বললেন, ও সব জায়গায় অবিশ্বাসের কিছু নেই। কে কোথা থেকে চুরি ক'রে হজম করতে পারে নি, সামলে নিতে হবে তো! নির্ম্মল বেহুঁশ হয়ে ছিল, তার সঙ্গে লোক দিয়ে গয়নাগুলো কাপড়ের কোণে বেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে। যার কথা বলছে সে তো একটা বাজারের মেয়ে। সুযোগ বুঝে ধর্ম্ম ক'রে নাম কিনছে।

নির্ম্মল দত্তবাড়িতে পুজো করতে গিয়েছিল তো?

সে ও যেমন নিত্যসেবার কাজে যায় তেমনি গিয়েছিল।

রূপা গামছাখানা কাঁধে ফেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাধাকে বললে, দৌলতপুরের জমিদারের নাতি অলোক রায় দেখা করতে চায়।

রাধা চকলেট রঙের শালখানা গায়ে জড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বললে, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই, কারও সঙ্গে দেখা করতে পারব না। ফের গিয়ে শুয়ে পড়ল শালটা গায়ে দিয়ে।

রূপা সামনে দাঁড়িয়ে বার কতক ঢোক গিলে আমতা আমতা ক'রে বললে, জমিদারের নাতি—গাড়ী বাড়ি, একরাশ গয়না, দরজায় দারোয়ান। আর কত কি—

রাধা বললে, বলেছি তো, আজ আমার শরীরটা ভাল নেই।

আজ আর মাটির দেহে রঙ ফলিয়ে বেশভূষায় চাকচিক্য ক'রে লোকের মন ভোলাতে মনে সায় দিল না। কি যেন একটা ব্যথা তার বুকে চেপে বসেছে। কিছুতেই সরানো যাচ্ছে না সেটাকে। দেহের বেসাতি ক'রে সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করেছে। উপকারও করেছে অনেককে অর্থ দিয়ে, তবু সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছে বৃশ্চিক-দংশনের মত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সুযোগ্য সন্তানেরা বিগ্রহের অলঙ্কার অপহরণ ক'রে এখানে আসে তৃপ্তিলাভ করবার জন্যে। অমাবস্যার

রাতে জোনাকি পোকা কতটা আলো দিতে পারে! জোনাকি ঈর্ষা করে চাঁদের ওপর। একটু হাসলে রাধা।

রূপা এসে দাঁড়াল। কথা বের হয় না মুখ থেকে।

রাধা গায়ের চাপা ফেলে উঠে ব'সে বললে, বলেছি না আজ কারও সঙ্গে দেখা হবে না।

রূপা বললে, যে বাড়ির গহনা চুরি গেছে সেই বাড়ির বাবু দেখা করতে এসেছেন। দত্তবাড়ির মালিক এসেছেন।

বিছানা ছেড়ে উঠে এল রাধা, গায়ের কাপড় সংযত ক'রে রূপাকে বললে, বাবুকে নিয়ে এস ওপরে। নিজে অপেক্ষায় রইল ঘরের দরজায়।

অবিনাশবাবুর পরণে শান্তিপুরি ধুতি, ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে কালো তালতলার চটি, কাঁচা-পাকা চুল। ঐশ্বর্য্য ঘোষণা করছে হাতের আংটিগুলো।

রাধা কাপড়ের ডগাটা বাঁ-হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে, বার কতক ঢোক গিলে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, দেখুন, আপনাকে বসতে বলবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই, মনে কিছু করবেন না।

অবিনাশবাবু বললেন, মানুষমাত্রেই যে তোমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখবে—এ কথা তো ঠিক নয়। কে কি সমস্যায় প'ড়ে এ পথ বেছে নিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে, কে তার খবর রাখে! ঘরের ডান দিকের একটা কাঠের চেয়ারে ব'সে একটা ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

ঘরের আসবাবপত্র বেশী নয়, একটা বড় গ্লাস-দেওয়া আলমারি, শ্বেতপাথরের টেবিল ঘেরা কয়েকখানি চেয়ার, টেবিলের ওপর কাচের পাত্রে কয়েকটা লাল মাছ। বিপরীত দিকে মেঝেয় তুলো-ভরা গদির ওপর সাদা চাদর বিছানো, মাঝে মাঝে রঙিন সুতোর ছুঁচের কাজ করা। আলমারির পাশে হালকা টুলে ফুলভরা ফুলদানি একটা। বড় আয়না একখানা, চারিদিকের দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি ঝোলানো।

অবিনাশবাবু বললেন, আমাদের বাড়ীর রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সমস্ত অলঙ্কার চুরি গিয়েছিল, তুমি এ বিষয়ে কিছু জান?

দূরে বিছানায় ব'সে মাথা হেঁট ক'রে রাধা বললে, হ্যাঁ জানি, আর আমি রূপোকে সঙ্গে দিয়ে গয়নাগুলো দিয়ে পাঠাই ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতে।

হ্যাঁ বাবু, মিথ্যে নয়! থানা পুলিস করবেন না, দিদিমণি বাবুকে অনেক কথা বলেছে।—রূপা বললে।

রাধা মাথা তুলে নম্রস্বরে বললে, নির্ম্মল রামহরি ভট্টাচার্য্যের ছেলে আগে তা জানতাম না। সে আমায় খুশি করবার জন্যে টাকার বদলে একরাশ গয়না এনে দিলে। দেখেই চমকে উঠলাম সাপের ঘাড়ে পা দেওয়ার মত, বুক কেঁপে উঠল দুরদুর ক'রে। শীতের দিনে ঘাম হতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। ভগবানের অলঙ্কার—কি করব স্থির করতে না পেরে শুয়ে পড়লাম মাথায় হাত দিয়ে।

নির্ম্মল ভটাচার্য্য তোষামোদ ক'রে জলের গেলাস মুখে ধরলে, নামল না জল গলা দিয়ে।

অবিনাশবাবুর স্থির দৃষ্টি রাধার ওপর নিবদ্ধ।

উঠে ব'সে রইলাম, কোন কথা বের হ'ল না মুখ থেকে, লজ্জায় ঘৃণায় গা শিউরে উঠল আমার। পূর্ব্বকালের ছবি-গুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে, পাপ পুণ্য বিচার করতে পারলাম না। গয়নাগুলো ফিরে দেওয়াই সমীচীন মনে করলাম।

নির্ম্মলের আসা-যাওয়া এখানে কতদিন?

বেশী দিনের নয়। সুস্থ মস্তিষ্ক ছিল না তখন নির্ম্মলের। পূজার বেশ তখনও ছাড়ে নি, লাল পাড় শুদ্ধ বস্ত্র, শুদ্ধ চাদর জড়ানো গায়ে, শিখায় তখনও ফুল বাঁধা ছিল। তাই দেখে ভাবলাম, কোন্ পাপে কলুষিত হ'ল রাধাগোবিন্দর গয়না-গুলো আমার ঘরে এসে! রাধাগোবিন্দর উদ্দেশে প্রণাম করলে রাধা।

রূপো সাড়া দেয়, হ্যাঁ বাবু, মিথ্যে নয়।

অবিনাশবাবু বললেন, তোমার সব কথা শুনলাম। আমার কিছু বলবার আছে, তাই এ পুরীতে এসেছি। রাধা-কিশনজীর গয়না চুরির সংবাদ পেয়ে ছুটলাম ভট্টাচার্য্য-বাড়ী, রামহরি ভট্টাচার্য্য মাথা হেঁট ক'রে মুখ লুকিয়ে বসতে বললেন, তোমার কথা সেখানে শুনলাম। যে এত মহৎ তাকে একবার দেখবার ইচ্ছা হ'ল। হ'লই বা সে পতিতা, রূপরসের

ব্যবসাদার। মনে ভাবলাম হয়তো অনেক টাকা আছে, তাই বিগ্রহের অলঙ্কার নিয়ে নিজেকে কলুষিত করে নি।

রাধা বললে, না, না, ও-কথা বলবেন না।

অবিনাশবাবু বললেন, মানুষ দূর থেকে দোষ গুণ বিচার করে, কাছে এসে দেখে না। উঠে পড়লেন অবিনাশবাবু।

রাধা উঠে দাঁড়াল। বললে, আপনাকে তো আর বসতে বলতে পারি না।

প্রায় এক বৎসর গত হয়েছে, প্রমীলার কোন খবর পাওয়া যায় নি, রাজলক্ষ্মীর মনের মধ্যে কি যেন একটা অমঙ্গলের ছোঁয়াচ লাগছে। কোন খবরই আসে নি ওদিক থেকে। কর্ত্তাকে রাজী করিয়ে বিনয় আর শান্তিকে পাঠিয়ে দিলেন জয়নগরে প্রমীলার খবর আনতে।

সদরের বার থেকে বিনয় ডাকে, প্রমীলা! বিমল!

শান্তি ডাকে, দিদি! মেজদিদি!

বিমলের মা, প্রমীলার শাশুড়ী সুন্দরী বামনী এসে দাঁড়াল সামনে, নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে তাদের দুজনকে। কাণা চোখটা ডাইনে ফেলে স'রে দাঁড়িয়ে বললেন, কে বাছা তোমরা? মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, কোথা

থেকে এসেছ? কি চাই? যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বল তো?

শান্তি জোর গলায় বললে, কলকাতায় বিমলবাবুর শ্বশুর-বাড়িতে, দিদির বাপের বাড়িতে—আমাদের বাড়ি, ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে মনে পড়ছে না? এইবার পড়বে, পণের টাকাগুলো গুনে নিয়ে একটা কিছু চাইলেন। আমি একটা লাল কাপড়ের থলে এনে দিলাম টাকা ভরতে, এবার মনে ক'রে দেখুন তো!

সুন্দরী বললেন, আচ্ছা ডেঁপো মেয়ে তো, এক কথা বললে, দশ কথা শুনিয়ে দেয়!

দিদি কোথায়, দিদি?

প্রমীলা কেমন আছে? বিমল কোথায়?—বিনয় বললে।

সে কি আর আছে বাছা! আমাদের বরাত, এমনি না হ'লে আমরা জব্দ হব কেমন ক'রে! আঁচলের খুঁট চোখে দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বিনয় শিউরে উঠল সুন্দরীর কথা শুনে। শুনতে ভুল হয় নি তো? কান্না শুনে ভুল ভেঙে গেল। বললে, বিমল কোথায়?

সুন্দরী কাণা চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, তাতে কি আর সে আছে বাছা—ম'রেও গেল আর মেরেও গেল। কি হ'ল না-হ'ল, গলায় দড়ি দিয়ে ম'লো। আর আমাদের মাথায় চিরদিনের মত কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেল।

আমার মুখ কালো ক'রে দিয়ে গেল, লোকের কাছে মুখ দেখাবার জোটি রইল না।

বিনয় বললে, আমাদের মেয়ে ম'লো, একটা খবর পর্য্যন্ত দিলেন না? এই যে বিমল—

শুনলে তো মার কাছে? কি হ'ল, কেউ টের পেল না, কত লোকে কত কথা বলে—মাথা নিচু ক'রে শুনতে হয় সে-সব কথা। কত বলেছিলাম—তোমার দুঃখ কি? কেন এমন করছ? কোন কথা কাণে নেয় না, না খেয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে প'ড়ে রইল দুদিন। আর বললাম—এখানে ভাল না লাগে, সেখানে যাও। কোন কথা না শুনে, ম'রেও গেল আর মেরেও গেল।

আর সাধুবাক্য শুনতে প্রবৃত্তি হ'ল না শান্তির, দাদার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এল।

সীমানা পার হয়েছে।

কে গা তোমরা? বোয়ের বাড়ির লোক লা?—ফুলমণি বললে। কচি বয়েস পার হয়ে যৌবনের উন্মত্ততায় দু-একটা বর্ষার জল পেয়ে কালো রঙে তার ফিকা ধরেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তরঙ্গ-উল্লাসে মাতোয়ারা হয়েছে। রূপের অহঙ্কার না থাকলেও অনেকের মন জয় করেছে। দেহভঙ্গিমায় অব্যক্ত প্রেম ব্যক্ত ক'রে তরল মনে চলাফেরা করে। ঘর-কাটা নীল শাড়ী দিয়ে গা ঢেকেছে, চুলের গোছাটা নেবে গেছে কোমর পর্য্যন্ত।

শান্তি বললে, হ্যাঁ, তুমি কে ?

আমার নাম ফুলমলি, আমার বাবা কানা ঠাকরনের জমি ভাগে চাষ করে আর আমায় উপরি খেটে দিয়ে যেতে হয় সকালে। বউঠান বাপ-মাকে দেখবার জন্যে কত পিড়াপিড়ি করেছিল, মা ঠাকরন সে লোক নয়। বললেন, যাবে তো একেবারে যাবে, কি অলক্ষ্মী মেয়ে গো—যে দিন থেকে ঘরে ঢুকেছে, তারপর থেকে সংসারে ভাঙন ধরল। গরু ম'ল, মামলা হ'ল, ধান চুরি গেল মাঠ থেকে—তাও বোয়ের দোষ।

শান্তি বললে বিনয়কে, শুনছ দাদা ?

মিথ্যা কথা নয় গো বাবু, মিথ্যা কথা নয়, মিথ্যা কথা ফুলমলি কয় না। খেতে দিত না বাবু, পেট পুরে খেতে দিত না। ব'লে বার কতক হাত নাড়লে। বউটাকে দিয়ে রাঁধিয়ে নিয়ে, মায়ে পোয়ে খেয়ে হাঁড়ি সিকেয় তুলে রাখত। এক বেলা সাতু জল খেয়ে দিন কাটাত।

বিমলবাবু কিছু বলত না ?—বিনয় বললে।

মায়ের ওপর কথা বলবে সে ছেলেও নয়, বয়স দু কুড়ি পার হ'লে কি হয়! ছোটখাট মার তো সকাল সন্ধ্যে রোজই খেত। সেদিন কি হ'ল, হাকিমের হুকুম বের হ'ল, মামলায় হেরে গেল সরিকের কাছে। দরজায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে গেল। সব রাগটা যেয়ে পড়ল বউটার ওপর, চিত ক'রে ফেলে গলা টিপে ধরেছে। বউটা গো-গো করছে, আমি বলি—কর কি কর কি, ম'রে যাবে যে! বলতে বলতে ঠকাস ক'রে

হাত দুটো পড়ল মাটিতে, চোখ দুটো বড় হয়ে ওপর দিকে উঠে গেল, তখন কাণা ঠাকরল ছেড়ে দিয়ে ডেকে ডেকে আর সাড়া পায় না। ছুটোছুটি ক'রে ঘরের মধ্যে পাগলা কুকুরের মত মাথায় হাত দিয়ে কি ভেবে নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে আমায় চুপ করতে বললে, মা তুলে ধরলে আর বেটা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে। এ কথা ফুলমলির কাছে ঢাকতে পারবে না। ব'লে বুকে চাপড় মারলে। আমি চলি দিদি, কাণা ঠাকরল জানতে পারলে আমার আর রক্ষে থাকবে না। ব'লে হনহন ক'রে স'রে পড়ল।

বাড়ি এসে বাবা মাকে বললে সব কথা। হয়েও গেল কয়েক মাস সেদিন থেকে।

ভট্টাচার্য্য মশাই শীতের দিনে, আহারপর্ব্ব শেষ ক'রে রৌদ্রে ব'সে আছেন। শান্তি ছুটে এসে বললে, বাবা, আমি আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছি, ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে যাচ্ছি।

কি খেলাটা শুনি ?

তিনতলার ওপর থেকে দড়ি ধ'রে রাস্তায় নামতে হবে। আমাদের মধ্যে আর কেউ সাহস পেল না, মাত্র আমি। আর

আর জায়গা থেকে অনেকে আসবে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর বাবা, আমি যেন তোমার সামনে পুরস্কার উপস্থিত করতে পারি।

ভট্টাচার্য্য মশাই চমকে উঠলেন, মুখে চিন্তার ভাব ফুটে উঠল, কপালে তিনটে খাঁজ পড়ল, এ খেলাতে কাজ কি মা? আরও অনেক রকম তো খেলা আছে। যেতে হবে না। কি হতে কি হবে। মনে মনে ভাবলেন, মা আমার অন্নপূর্ণা। গচ্ছিত ধন হারিয়ে না যায়! সাহসের প্রশংসাও করতে লাগলেন। এত রকম খেলা শিখে হ'ল না? দুঃসাহসিক খেলায় কাজ নেই। দেখ না তোমাদের সমিতি থেকে আর কেউ সাহস করছে না।

আর সেইজন্যেই তো আমাকে যেতে হবে। আমাদের কেন, অন্য সমিতি থেকে যারা আসবে তারা নাম দিয়েছে বটে, কিন্তু সকলে এ খেলা খেলবে না। দৌড়ে বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে "আসি বাবা" ব'লে, বিনয়ের হাত ধ'রে টেনে সদর-দরজা পার হয়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'ল শান্তি; পারুলকে ডেকে ছিল—রাজলক্ষ্মী পাঠান নি।

শহরের মধ্যে বড় রাস্তার ওপর তিনতলা বাড়ীর ছাদে রশি বাঁধা হয়েছে। পথচারীরা দাঁড়িয়ে পড়ে দেখবার জন্যে, নিচে দড়ির জাল ধরা হয়েছে—দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। যারা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে শান্তি একজন। পয়লা নম্বরের ছাপ তার

পিঠে বাঁধা আছে। সাদা সিল্কের ব্লাউজ ঢেকে রেখেছে পাতলা নীল শাড়ী দিয়ে। কাপড়ের ডগাটা শক্ত ক'রে কোমরে বাঁধা আছে। চুলের গোছা দুদিকে দুটো ঝুলছে।

বাঁশীর শব্দ শুনে তিনতলায় ছোটে খেলোয়াড়েরা। শান্তি দাঁড়িয়ে থাকে দেখবার জন্যে, বিনয় হাতে তালি দিয়ে উৎসাহ দেয় শান্তিকে।

চাপা হাসি হেসে, ডান হাত নেড়ে শান্তি বললে, না বাবা, পারব না, শেষে প'ড়ে মরব! আর আর মেয়েরা তিনতলায় উঠে রাস্তার দিকে লক্ষ্য করে। বুক কেঁপে ওঠে তাদের, মাটির দিকে টেনে নেয় দেহটাকে চম্বুকে লোহা টানার মত। শান্তি বান্ধবীদের বললে, পারব তো?

বান্ধবী ব্যাগ থেকে একটা চকলেট বের ক'রে পুরে দেয় শান্তির মুখে, বলে, ভয় কি। নীচে লোক আছে ধ'রে ফেলবে।

আর আর মেয়েরা বারান্দা থেকে উঁকি মারে, রেলিং টপকে দড়ি ধরতে সাহস করে না। সমিতির উদ্যোক্তারা চঞ্চল হয়ে পড়ে, সকলেই অস্বীকার করলে নামতে।

বিনয় ডাকে শান্তিকে।

শান্তি ছুট দিল, লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠল তিন-তলায়। রেলিং পার হয়ে দড়ি ধরেছে শান্তি, রাস্তার লোক হাঁ-হাঁ করছে—এই গেল বুঝি পড়ে! কেউ বলে—গেছো মেয়ে, কেউ বলে—সাহস আছে বটে, বৃদ্ধেরা বলেন—

দরকার কি বাবা, মেয়েছেলে, সংসারধর্ম্ম করতে হবে তো!

শাস্তি তখন দোতলার কার্নিস পার হয়েছে। হৈ-চৈ প'ড়ে গেল, হাততালি পড়ল, প্রশংসায় মুখরিত হ'ল চতুর্দ্দিক। তার ধবধবে হাত ত্বখানা আর সাদা মুখ লাল হয়ে গেছে রক্তের চাপে।

পুরস্কার মাথায় ক'রে বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এল শান্তি। বাবাকে প্রণাম ক'রে দেখালে তার কাপটা।

রাজলক্ষ্মী দমদম ক'রে ঘরে এসে নথটা নাড়া দিয়ে বললেন, কাপ কি আর কেউ কখনও পায় না? এত হৈ-চৈ কিসের?

শান্তি মাকে প্রণাম করলে।

থাক্ থাক্, হয়েছে। কি দস্যি মেয়ে বাবা, দরকার কি ওসব খেলায়! দেখ না তোমার দিদি পারুল, ওসব হৈ-চৈয়ের মধ্যে নেই, ঘরে সেলাই-ফোড়া নিয়ে ব'সে থাকে। বামুনের মেয়ে এত লম্ফঝম্ফ কি দরকার? কর্ত্তার আদরে মাথায় উঠে গেছে। পারুল, অ পারুল!

যাই মা।—ব'লে পারুল আসে মায়ের কাছে।

তোমার হাতের সেই নেটের কাজটা, কাচ-বসানো ব্লাউজটা, টেবিল-ক্লথটা—দেখাও তো একবার এদের।

সকলেই এক সঙ্গে হেসে ফেললে, মুখে হাত দিয়ে।

শান্তির মা আমাদের ছুঁচের কাজ দেখাতে এসেছেন!—একজন বললে।

একজন বললে, আচ্ছা, শান্তিকে দেখে মনে হয় না ওর মা।

আর একজন বললে, বলে তো তাই।

শান্তির গালে টোকা দিয়ে চোখের ভাষায় কি ব'লে চ'লে গেল, আলো-আঁধারে বোঝা গেল না তাদের ভাবের ইঙ্গিত।

তাদের ভাবের ইসারার বোঝা-পড়া তারাই জানে।

শান্তির চলাফেরা বিদ্যুতের মত, চমক দিয়ে চ'লে যায়, ধরা দেয় না কাউকেই। লেখাপড়া খেলাধুলা নিয়েই সময় কাটে তার।

ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন, এই যে শান্তি, তোমার ছোড়দা অফিসের কি কাজে পাটনা যাচ্ছে, তুমি দিন কতক বেড়িয়ে এস না, মন ভাল থাকবে আর শরীরটাও সেরে আসবে। বিনয়কে ব'লে দিচ্ছি।

প্রথমটা আপত্তি করলে বিনয়, পরে সায় দিলে।

দরকারী টুকি-টাকি জিনিস নিয়ে বিনয় পাটনার অফিস-কোয়ার্টারে উঠল। বিনয় অফিসের কাজ সেরে সময়মত বেড়াতে বের হয় শান্তিকে নিয়ে, যানবাহনের দরকার হয় না, হেঁটে চ'লে যায় অনেক দূরে ফেরবার কথা ভুলে গিয়ে।

ডান দিকের সরু পথটা দূরে গিয়ে জঙ্গলে মুখ লুকিয়েছে। চলতি পথটা মোড় ফিরে নদীতে মিশেছে। পাশের বড় গাছে ব'সে নাম-না-জানা পাখির কচকচানি শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটা বালি-ভরা গরুর গাড়ির চাকার কাঁচ-কাঁচ আওয়াজ দূর থেকেই কাণে আসছে। রেল-ইঞ্জিনের বাঁশীর শব্দও ধরা পড়ছে তাদের কাণে। চলে আর কথা বলে, বিনয়ের চাপা হাসি ধরতে পারে না শান্তি। বারবার চোখ ফেলে বিনয়ের মুখে আয়নার মত। বিনয় কথা বলে, ফিকে হাসি মিলিয়ে যায় তখনি। নদীর ধারে দুজনে এক পাথরে ব'সে শান্তি প্রশ্ন করে, আর বিনয় বুঝিয়ে দেয়।

ওটা কি?—শান্তি বলে ঝুলন্ত বাবুই বাসাটা দেখিয়ে।

বাবুই, বাসাঘর বেঁধেছে, বাচ্চাদের পালন করবার জন্যে। ঐ দেখ উড়ে যায় পাখি দুটো।

মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তি বললে, বেশ আছে, না? ভয় নেই, ভাবনা নেই, হিংসা নেই ওদের ওপর কারও।

বিনয় শান্তির মুখের দিকে চেয়ে বললে, আমি তোমায় বিয়ে ক'রে ঐ রকম ছোট্ট ঘর বাঁধব নির্জ্জন নিঝুম জায়গা বেছে নিয়ে। কোন অভিসম্পাত বা আশীর্ব্বাদ পৌঁছবে না সেখানে।

ভাই বোনে বিয়ে হয় না কি?—উঠে প'ড়ে শান্তি স'রে যায় দূরে।

বিনয় ফুলের ডাঁটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, তুই আমার বোন নয়, বিশ্বাস কর্ তোর ছোড়দার কথা। এত দিন যা জেনে এসেছিস সেটা কিছুই নয়, সব মিথ্যে।

মা, বাবা, তুমি—সব মিথ্যে ?

হ্যাঁ, সব মিথ্যে, তোর ছোড়দা তোকে পাবার জন্মে, আঁকড়ে ধ'রে আছে প্রমাণগুলো। অনেক দিনের আশা সুযোগ পেয়ে ফুটে বেরিয়ে পড়ল।

তফাতে স'রে গেল শান্তি উড়ো মন নিয়ে, দেহখানা টানতে পারছে না পা দুটো। বুকটা চেপে ধরে অসহায় শিশুর মত, চিন্তার ভারে মাথাটা নুইয়ে পড়ে মাটিতে।

বিনয় কাছে এসে বললে, বিশ্বাস কর্ তোর ছোড়দার কথা। তোর বাপ-মার ফোটো আর তোর বাপের হাতের লেখা ডাইরি আছে আমার কাছে, অনেক ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে রক্ষে করেছি সেগুলো।

আমি তা হ'লে—

বোস, কায়েস্থ। বাপ মা তো সমর্থন করবেন না এ বিয়ে। না করুন, বেছে নেব আমরা নিজেদের পথ।

ছোড়দা, দেখাতে পার আমার মা-বাবার ছবি ? বাবার হাতের লেখা ডাইরি ?

কলকাতায় গিয়ে সব দেখাব, তোর বাবা বড় ডাক্তার ছিলেন, মাও বিলেত-ফেরত ডাক্তার, আদি অন্ত সব লেখা আছে তাঁর ডাইরিতে।

চলার পথে কোন কথাই বললে না শান্তি। মা বাবা ভাই বোন আত্মীয় বলতে আজ তার কেউ নেই। বাড়ি এসে তার মাথা লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতের শেষে উষার আলোতে ডাক ছাড়ে মোরগের দল। উঠে বসে শান্তি গা ঝাড়া দিয়ে। অগোছালো চুলগুলো গোছ ক'রে নেয়। ভারাক্রান্ত দেহখানা আবার লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। কত চিন্তা ভেসে আসে, ভেসে যায় ছায়াছবির মত।

বিনয় ডাক দেয় কড়া নেড়ে—শান্তি, ওঠ্, বেলা হয়েছে, তোর আজ কি হ'ল বল্ তো?

মাটিতে পড়া আঁচলটা তুলে দরজা খুলে শান্তি বললে, আমরা কবে বাড়ি যাব ছোড়দা?

সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি, আমরা আজই বাড়ি যাব, রাত্রি দশটার গাড়ীতে।

ফিরে এল কলকাতায়, দেখাও হ'ল মা-বাবার সঙ্গে। কথা বলতে পারে না শান্তি। কে যেন স্মরণ করিয়ে দেয় সে কথা, কথা বের হয় না মুখ থেকে। দ্বন্দ্ব বেধে যায় মনের মধ্যে। সত্যকে পরাস্ত ক'রে মিথ্যাই স্বীকার ক'রে নিতে হয় শান্তিকে। বারকতক ঢোক গিলে জড়তা কাটিয়ে বললে, বেশ ছিলুম বাবা সেখানে, খাওয়া আর বেড়ানো—ঐ তো কাজ। গাছের মাথায় চাঁদের আলো, সুর-মেলানো পাখির ডাক আমার বড় ভাল লাগত।

পায়ের ধুলো নেয় মা-বাবার। চেয়ে থাকেন শান্তির মুখের দিকে তাঁরা।

শান্তি ছুটে যায় ছোড়দার ঘরে, দাবি করে মা-বাবার ছবি আর ডাইরি।

তোকে ঠিক সময়ে দেখাব ব'লে মা-বাবাকে মিথ্যা ব'লে সরিয়ে রেখেছি। তোর কেউ কোথাও নেই, স্মৃতিচিহ্ন দেখাব ব'লে লুকিয়ে রেখেছি। কয়েকখানা ছবি আর একটা ছোট ডাইরি শান্তির হাতে দিলে।

ডাইরির শিরনামায় লেখা আছে "খেলাঘর"।

বুকে চেপে ধরে বারে বারে। চোখ বড় ক'রে দেখে ছবিগুলো। তৃপ্তি মেটে না তাতেও। ঝরণার জলে ভাসে চোখ দুটো। অস্থিরতা বেড়ে যায় ডাইরি প'ড়ে। সে পড়ে—

"খেলাঘর"

"তোর বাবা বিলেত-ফেরত ডাক্তার, মাও বিলেত গিয়েছিল ডাক্তারি শিখতে। অর্থ, মান, যশ কিছুরই অভাব নেই, অর্থের লালসায় জাল ওষুধের কারবার করলুম। পয়সাও পেলাম অজস্র। খুনে কাজ গোপন রইল না, ফুটে বের হ'ল

পারার মত। খবর চ'লে গেল পুলিসের দপ্তরে। এক বৎসরের শিশু রেখে তোমার মা মারা যায়। আমার গা-ঢাকা দিয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। ছদ্মবেশে কয়েক দিন কাটিয়েছি কেবল তোমার ভবিষ্যতের জন্যে। কি ভাবে আমার জীবনটা শেষ হবে বোধ হয় ভগবানও ঠিক করতে পারেন নি। উইলের মর্ম্মে লেখা আছে, তোমার লেখা-পড়ার এবং স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য ব্যয়ে কার্পণ্য করবেন না রামহরি ভট্টাচার্য্য। কোন হিতৈষী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব খুঁজে না পেয়ে, বোস-বংশের কুল-পুরোহিত—তাঁর দ্বারা কোন অহিত কাজ হতে পারে না জেনে—তোমায় তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি। তোমার বিবাহের ভার তোমার নিজের হাতেই রইল, হস্তক্ষেপ করিতে চাই না তোমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায়। হয়তো আমার শেষ খবর কেউ টের নাও পেতে পারে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আজ আমি ফেরার আসামী। আমি জানি, তুই বড় হবি, লেখাপড়া শিখবি, বিলেত যাবি—দশজনের একজন হয়ে পরিচয় দিবি। এ যে আমার আশীর্ব্বাদ। তোর মায়ের নাম সরলা, আমার নাম জানতে চাস না।”

আরো অনেক কিছু লেখা ছিল ডাইরিতে।

বিনয় চ'লে যায় ঘর থেকে। কপাট বন্ধ ক'রে দেয় শান্তি। বই আর ছবি বারে বারে দেখে আর পড়ে, তৃপ্তি হয় না কিছুতেই। মনে পড়ে মায়ের স্নেহের ব্যবধান,

পুরস্কার পাই তিরস্কার। কৃত্রিম ভালবাসা স্মরণ করিয়ে দেয় পিতার ডাইরি। মনে পড়ে, ও-বাড়ির টেবিল চেয়ার আলমারিগুলো, পুরানো ছবিগুলোও ভেসে আসে চোখের সামনে। অন্তরের বেদনায় লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। চেপে ধরে দু হাতে বালিশটাকে।

ভট্টাচার্য্য মশাই শান্তিকে ডাকলেন।

ধীরে ধীরে ঘরে এসে আলমারির হাতলটা ধ'রে দাঁড়াল।

তোকে আজ বিমর্ষ দেখছি কেন মা? কি হয়েছে? তোর মা কি কিছু বলেছে? শরীর খারাপ হয় নি তো? কি জানিস মা! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, সর্ব্বদাই মনে ভয় হয় তোকে বুঝি হারালাম। কেন, তা জানি না। কথার শেষে ব'লেও ফেলেন, মা আমার অন্নপূর্ণা।

কি বললে বাবা?—দু পা এগিয়ে আসে শান্তি।

তোর বড়দা কোম্পানীর কাজে শিলং যাবে, তুই যাবি? দিন পনের দেরি আছে।

কাঞ্চন মার সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে। শান্তিকে ডাকে মার ঘরে, বলে, এইটে সই ক'রে দাও তো।—ব'লে একখানি সাদা কাগজ বের ক'রে দেয়। ইতস্তত করে শান্তি। বড়ও

হয়েছে, বুঝতেও শিখেছে, জেনেও গেছে—সে এ বাড়ির মেয়ে নয়। মায়ের স্নেহহীন চক্ষু দেখে "না" বলতে পারলে না বড়দাকে।

কাঞ্চন পকেট থেকে খানকতক করকরে দশ টাকার নোট বের ক'রে তার হাতে দিলে। বললে, তোমার খরচ তো আছে—লাইব্রেরী, ক্লাব, সোসাইটী, সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধুবান্ধব।

শান্তি একবার বড়দার মুখের দিকে তাকিয়ে খসখস ক'রে চালিয়ে দেয় কলমটা। বুঝতে পারে না বড়দার দানের মহিমা।

সই-করা কাগজখানা পকেটে রেখে কাঞ্চন বললে, শান্তি, আমি শিলং যাচ্ছি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে? আর তা ছাড়া তোমার বৌদিও তো সঙ্গে থাকছে। বেশী দিন থাকব না সেখানে।

শান্তি বললে, সেখানে নাকি খুব ভাল সহর আছে পাহাড়ের ওপর? ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে পাণ্ডু, সেখান থেকে গাড়ী বদল ক'রে শিলং যেতে হয়। আমার এক বন্ধুর বাবা গিয়েছিলেন। তার কাছে শুনেছি।

শান্তি, তুই শিলং যাচ্ছিস নাকি বড়দার সঙ্গে? আমি যাব যে।—বিনয় বললে।

কাঞ্চন বললে, তোমার না গেলে হ'ত না, তা ছাড়া কদিনই বা থাকব সেখানে।

কদিন হ'ল শিলংয়ে এসেছে। বেড়াতে বেরিয়েছে তারা দুজনে। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে শান্তি, বিনয় গলা ছেড়ে হাঁক দেয় পিছন থেকে, "শান্তি" "শান্তি" ক'রে। পিছনে তাকায় আর মুখ টিপে হাসে।

হঠাৎ ঠোক্কর খেয়ে প'ড়ে যায় শান্তি।

কথা না শোনার ফল হাতে হাতে ফলেছে।

নাকিসুরে শান্তি বললে, চলতে পারছি না।

আমি কাঁধে করব? না, এখানে কোন গাড়ী আছে? পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে যাব তোমায়। গাধা পেটার মত।

একটা উঁচু জায়গায় ব'সে তারা দুজনে চেয়ে থাকে দূরে পাহাড়িয়াদের ঘরের পানে। নাচ-গানের সুর ভেসে আসে দূর থেকে।

শান্তি বললে, পাহাড়িয়াদের গান শুনে আসি, ফেরবার এখনও অনেক দেরি আছে।

পায়ের ব্যথা সেরে গেছে?—উঠে দাঁড়াল বিনয়।

কোন শব্দ এল না ওদিক থেকে।

দাঁড়াল দলবদ্ধ নাচ-গানের সামনে তারা দুজনে। মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে নাচ-গান সুরু করেছে। একজন পাহাড়িয়া পাশে এসে ফিসফিস ক'রে বললে, হাসবেন না বাবু, হাসা-হাসি এরা পছন্দ করে না।

নাচ-গান পুরোদমে চলছে, ওদের বাজনা বাজছে তালে তালে, অঙ্গ নাচে তাল বাঁচিয়ে। সবই যুবক যুবতীর দল, ছোট বড় নেই বললেও চলে। তারা গানের সুরে রসে রঙ্গে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে হেঁই-হেঁই ক'রে লাফিয়ে ওঠে একসঙ্গে সকলে। রঙ্গ দেখে ঠেলা দেয় শান্তি বিনয়কে।

চলার পথে শান্তি বললে, এরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে গা ঢেলে দিয়ে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে। সহরের খর দৃষ্টির বাইরে আছে ওরা। রূপ আর রস একই পাত্রে মিশে আছে, ব্যবধান রাখেনি এতটুকু।

দিনের শেষে চাঁদের আলোয় পথ দেখে ফিরে আসে ওরা।

কাঞ্চন হাতের ঘড়িটা দেখে বললে, শান্তি, কাল কোন্ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলে?

শান্তি বললে, পাহাড়ের ওপরে পাহাড়ী পল্লীতে বেশ লাগল ওদের নাচ গান। নামতে যা কষ্ট হয়েছিল বড়দা, আমি তো প'ড়েই যেতাম।

কাঞ্চন বললে, ওবেলা কোথা যাবে?

অন্য দিকে শহরের ছবি তুলতে যাব।

আমি ওদিকেই যাব, তুমি পোষাক বদলে নাও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায় দিতে হ'ল শান্তিকে।

কাঞ্চন ঘড়ি দেখে ঘন [illegible]ন, উঠে দেখে এদিক ওদিক

ঘনশ্যাম আর প্যারীলাল ঘরে ঢুকল।

কাঞ্চন সামনের চেয়ার দেখিয়ে দিল তাদের।

ঘনশ্যাম মাথার পাকড়িটা খুলে টেবিলে রেখে বললে, আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে কাঞ্চনবাবু। প্যারীলাল সিনেমার ছবি তুলবে, আজ সবেরে ছাপামে নিকলা, কাল ন বাজে টাইম থা। কাল তো পিছেকা বাত হ্যায়, দশ বাজেসে আনেকা স্নুরু হোগিয়া, বাত করনেকা ফুরসত মিলতা নেই। কেতনা ছুকরী—আরে বাপ রে বাপ—সিন্ধিয়া, নেপালী, আসামী, বাঙ্গালী, উড়িয়া বি আগিয়া। কা বলেগা বাবু, কমসে কম পচাস-ষাট আদমী। সব তাজা তাজা—। ব'লে জিভ কাটলে ঘনশ্যাম।

প্যারীলাল বললে, ও বাত ছোড় দেও, হিঁয়াকা কাম সার লেও। এতনা বাত করনেকা ফুরসত কাঁহা ?

শান্তি গায়ে মুখে রঙ চড়িয়ে, জাঁকজমক পোষাক প'রে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। লোক দুটোকে দেখে ফিরে এল শান্তি, ভাল লাগল না তাদের চোখগুলো, তীরের মত খোঁচা বিঁধল সারা অঙ্গে, লালসায় উন্মত্ত হিংস্র পশুর মত তাদের দৃষ্টি।

কাঞ্চন বললে, এর কথাই বলেছিলাম।—একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লে।—এর দ্বারা অনেক কিছু পাবেন—গান, বাজনা, সাঁতার, সাইকেল, লেখাপড়া সব কিছু জানে ও। আপনার ষ্টুডিওর অনেক কাজই ওর দ্বারা সম্ভব হবে।

কয়েকটা কথা কাণে যায় শান্তির, চমকে ওঠে বুকখানা, শিউরে ওঠে সারা দেহটা। ভেবে পায় না, ভবিষ্যৎ কোথায় !

প্যারীলাল ঘনশ্যামকে বললে, তিন হাজার টাকা দে দিজিয়ে। যো হোগা দেখা যায়গা।

বহুৎ চড়া দাম দে দিয়া ভাই, বোল দিয়া আর কেয়া হোগা, এত্তনা দামী চিজ নেই হ্যায়।

কি বলছেন আপনি ? বাজার ডুবে গেল নাকি, শেয়ার পড়ার মত।

প্যারীলাল বললে, আমার খেয়াল ছিল উসকো দেকে সব কাম সার লেগা, লেগিন ও চিজ নেই হ্যায়।

কাঞ্চন বললে, একদিনে এত ডাউন হয়ে গেল ?

ঘনশ্যাম বললে, একদিনে কি বাবু, চার ঘণ্টামে ! আরে বাপ রে বাপ, ছাপামে দেখা আর দৌড় দৌড়কে আয়য়া। কাল বাত হুয়া থা, উসি বাতসে আয়য়া।

প্যারীলাল গা টিপে দিলে, আর দাম বেড়ো না, এতেই কাজ হয়ে যাবে।

কাঞ্চন বললে, আগে তো পাঁচ হাজারের কথা ছিল, কিছু বাড়ুন।

ঘনশ্যাম এদিক ওদিক দেখে বললে, আচ্ছা, আর একবার দেখায় দিন তো। ডেলিভারি আজকে দেবেন তো ?

কাঞ্চন বললে, ডেলিভারি দেবার জন্যেই তো বিকেলে

বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। একবার কেন, দশবার দেখুন না।—ব্যস্ত হয়ে ডাকে, শান্তি, দু কাপ চা নিয়ে আয় তো।

প্যারীলাল বললে, শরীরে কোন ব্যাধি বা চামড়ায় কোন, এই মানে—

স্বাস্থ্য দেখে বুঝতে পারছেন না?

ঘনশ্যাম বললে, কাঞ্চনবাবু কি মিথ্যা কথা বলবে?

শান্তি ভয়ে ভয়ে চা নিয়ে আসে। পা কাঁপে থরথর ক'রে, তাকাতে পারে না তাদের বিষ-মাখা চোখের দিকে।

প্যারীলাল বললে ঘনশ্যামকে, আর পানশো দে দেও, কা হোগা! কই কামসে রূপিয়া উঠায় লেগা।

কাঞ্চন রাজী হয় না তাদের কথায়।

চায়ের কাপ প'ড়ে যায় শান্তির হাত থেকে।

ঘনশ্যাম বললে, ডর কি আছে? খানাপিনা, শাড়ী, গহনা বহুৎ মিলেগা।

তা হয় না, চলুন।—ব'লে কাঞ্চন তাদের নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দু'কথা প্রকাশ হয়ে যেতে পারে ঘরে থাকলে।

সন্দেহ দূর হয়ে যায় শান্তির। ওপর নীচে, ভিতর বার খোঁজ করে ছোড়দার। পায় না কোথাও ছোড়দাকে। ছুটে গিয়ে দেখে ভীমকায় লোক দুটোর গতিবিধি। নজরের বাইরে চ'লে গেছে তারা। কর্ত্তব্য স্থির ক'রে নেয় তখনি। এদিক ওদিক পকেট হাঁটকায়, টাকার সন্ধানে। পেল ছোড়-

দার বাক্সের চাবিটা। বাক্স খুলে কাপড় হাঁটকে ষাট টাকা পেল শান্তি। বউদিদিকে বললে, আমি পাশের বাড়িতে আছি। বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। হোক না কেন একা অসহায়, তাকে যে যেতেই হবে এখান থেকে। পিছন দিকে তাকায় ভয়ে ভয়ে। মেঘ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ক্ষণেকের মধ্যে। চোখের সামনে পাখি ছুটছে বাসার দিকে। মেঘ-গর্জ্জনের ঘনঘটা বেড়েই চলেছে, বিদ্যুৎ চমকায় ঘন ঘন, সাঁ সাঁ করে গাছের দোলানি শব্দ। দু পা চলে আর মুখ মোছে, ভিজে চুলগুলো সরিয়ে দেয় মুখ থেকে। পারে না ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে এগুতে। টিকিট-ঘরের সামনে গিয়ে বললে, একখানা পাণ্ডুর টিকিট দিন তো, দশ টাকার নোট একখানা বার ক'রে দেয় শান্তি।

ভিতর থেকে টিকিটবাবু বললে, তোমায় তো টিকিট দেওয়া হবে না, একা মেয়েছেলে, সঙ্গে কেউ নেই—ঝড় জলের দিনে আমি টিকিট দিতে পারি না।

শান্তি চমকে ওঠে, এদিক ওদিক দেখে ব্যস্ত হয়ে বললে, সে কি ? কলকাতায় আমার মার অসুখ—টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটছি। দাদা এখানে নেই। বাড়ি আমাকে যেতেই হবে।

টিকিটবাবু একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে বললেন, দু-দিনের পথ, একলা মেয়েছেলে রাস্তায় বিপদ হতে পারে। একখানা টিকিট দিলেন, সঙ্গে খুচরো কয়েক আনা পয়সা।

শান্তি পাণ্ডু ষ্টীমার-ঘাটে এল রাত্রি এগারটায়, একটু চা আর কিছু খাবার খেয়ে নিল ষ্টীমারে ব'সে। দৃষ্টি ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ওপারে মিশে গেছে পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের সঙ্গে। কি যেন নড়ছে জলের মধ্যে! কি যেন ভেসে যায় সারি দিয়ে।

ষ্টীমার ভেসে যায় দোলা দিয়ে, যাত্রীরা সাবধান হয় বিপদের হাত থেকে। শান্তি দুরন্ত চুলগুলো সরায় মুখ থেকে বারে বারে। চিন্তার ছায়া পড়ে ধবধবে মুখখানায়। ষ্টীমার থেকে নেমে ট্রেনে বসেছে, দূরে এক কোণে। সামনের লোকটা একবার শান্তিকে দেখে আর পত্রিকার পাতা ওল্টায়, চাউনি তার বাঁকা। চেনা মুখ মনে হচ্ছে, কোথায় দেখেছি একে? লোকটা পিছু নিয়েছে। প্যারীলালের লোক, না পুলিশের লোক! জেগে থাকে শান্তি নিজেকে সাহসে শক্ত ক'রে। সুযোগ খোঁজে পাশ কাটাবার। শেষ রাত্রে একটা ছোট ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। দু-একটা তেলের বাতি মিট-মিট ক'রে জ্বলছে তখনও। ফেরিওয়ালার হাঁক-ডাক নেই বললেও হয়। ঘণ্টা পড়ল গাড়ী ছাড়বার, লোকটা বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে। এ সুযোগ হারালে না শান্তি, নেমে পড়ল চকিতের ন্যায় গাড়ী থেকে। হুহু শব্দ ক'রে গাড়ী ছুটে গেল সীমানা পার হয়ে। বিপদকে এড়িয়ে চলে বারে বারে, পারে না স্থির করতে জীবনের শেষ নির্দ্দেশ। রেল ষ্টীমার, ষ্টীমার রেল—এই ক'রে আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে কলকাতায় পৌছিল শান্তি।

ভট্টাচার্য্য মশাই, রাজলক্ষ্মী চমকে উঠলেন একা শান্তিকে দেখে।

ভট্টাচার্য্য বললেন, তুমি একা শিলং থেকে এলে? তোমার দাদারা কোথায়?

শান্তি সব কথা ব'লে ফেলে, গোপন করে না এতটুকু।

রাজলক্ষ্মী গাল দেয়, ছোট বড় কথা বলে, সোমত্ত মেয়ে জোয়ারের জলে ভাসছে, কোথায় যাবে কুল কিনারা নেই। কে সঙ্গে ছিল না-ছিল তাই বা কে জানে! আমরা এমনটি কখনও দেখিনি, কাণেও শুনিনি। আমার পারুল সে রকম নয়, একলা ঘরের চৌকাঠ পেরয় না। এক জোড়া পান মুখে দিয়ে বললেন, বাপ-মা খেয়েও শান্তি নেই, অশান্ত মেয়ে। সারাদিন রঙ মাখা আর ওড়না দোলানো হচ্ছে। যজমানের মেয়ে এতকাল পুষলুম, এখন বিয়ের ভাবনা ভাবি।

ভট্টাচার্য্য বললেন, বিনা কারণে তুমি ওকে বকাবকি করছ কেন?

কারণ অকারণ নিক্তির কাঁটায় ওজন ক'রে রাজলক্ষ্মী বলে না—পার তো নিজে হাতে ঝাড়ু দিয়ে সাফ ক'রে দাও ঘরের ময়লা।

ভট্টাচার্য্য বললেন, মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

তুমি তো দিনে তেরোবার ঐ কথা বলছ, নিজের ছেলের কথা তো একবারও বের হয় না মুখ থেকে।

শান্তি সে কথায় কাণ না দিয়ে পারুলকে বললে, স্কুলে থিয়েটার দেখতে যাবে? আমার আবৃত্তি শুনতে?

পারুল বললে, না, আমার হাতে অনেক কাজ আছে, মেজদাদার পুলোভারটা তাড়াতাড়ি সেরে দিতে হবে।

পারুলের লজ্জা হয় স্কুলে যেতে। পারে না যোগ দিতে নাচ-গানের আসরে, খেলাধুলার মাঠে, কার্নিভ্যালের আকাশ-ছোঁয়া চাকায় বসতে। ঘরে তাকে ছুঁচ-সুতো দিয়ে আটকে রেখেছে।

সুন্দরী ঘরের দাওয়ায় ব'সে তেঁতুল কাটছে, কলাপাতায় একতাল তেঁতুল, বিচিগুলো ইতস্তত ছড়ানো, একটা ছোট বাটীতে অল্প একটু তেল। রোদের তাপে রেখেছে এলো-চুল।

ও-বাড়ির পটলের মা এসে বসলেন। পরণে থান কাপড়, গলায় তুলসীর মালা, ললাট আর বাহুতে চন্দন তিলকমাটি অঙ্কিত চিহ্ন, মাথায় চুল কাঁচা-পাকা মেশানো। এদিক ওদিক দেখে খাটো গলায় বললেন, দিদি, বিমলের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি মুকুজ্জে-বাড়ি থেকে, বাবুরা কেউ এখনও জানে না। চপলার মা গোপনে আমায় পাঠিয়েছে, তুমি

দিদি রাজী হ'লে সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটা ডাগর-ডোগর, আঁটসাঁট গড়ন, রঙের ঝলক বেশী নাই বা হ'ল। নেকাপড়া? কি দরকার দিদি? ওসব শহরে মেয়েদের জন্যে। বউ একেবারে খালি হাতে আসবে না। দান-সামগ্রী, এটা ওটা—অনেক কিছু দেবে চপলার মা।

বঁটিতে নজর রেখে, একটু ভারী গলায় সুন্দরী বললে, আমি এখনও বিমলের বিয়ের কিছুই ঠিক করতে পারিনি ভাই। বউটা ম'রেও গেল আর মেরেও গেল। লোকে বলে—আমরা মা-বেটায় খাঁচায় পুরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছি। গলা টিপে মেরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। লোকে তো জানে না ঘরের কথা, আর বলবারও নয়। আমি একটু খেটে খুটে গড়াই, বিমল বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে, পাশের বাড়ির ডেঁপো ছেলেটার সঙ্গে কি এত কথা দিদি? দশ দিন চোরের, একদিন সাজা। আমাদের কি ও-বয়েস ছিল না! এ কথা তো আর লোককে বলবার নয়।

গালে হাত দেয় পটলের মা, বলে, অবাক করলে দিদি!

সুন্দরী বললে, এত কথা শোনবার পর আর কেন পটলের মা! তবে হ্যাঁ, বিয়ে যদি দিতে হয়, তবে ঐ ভট্টাচার্য্যের বাড়িতেই দেব। তা না হ'লে আমার নাম সুন্দরী বামনী নয়। দশ কথা বলতে ছাড়েনি লক্ষ্মী, কি ক'রে মিষ্টি কথা ব'লে চোখের জল ফেলে কাজ হাসিল করতে হয়, সেটা জানে সুন্দরী বামনী।—বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

তা বটে দিদি, ঘর বজায় তো হবে, আর দুটো ডাগর ডোগর মেয়ে আছে—আমাদের পটল বলে।

কি বলে পটলের মা ?

একবার এদিক ওদিক চেয়ে পটলের মা বললে, আমাদের পটল কোথা থেকে শুনে এসেছে, ছোট মেয়েটা না কি ওদের মেয়ে নয়, নারায়ণ জানেন দিদি !—ব'লে জোড় হাতে প্রণাম করলে।—কে ডাক্তার নাকি ছোট মেয়েটাকে পুষতে দিয়ে গেছে।—মুখ বিকৃতি ক'রে—জেতের ঠিক আছে কি না তাই বা কে জানে !

বিমলের বিয়ে দিতে গিয়ে দেখে, আমারও যেন কেমন কেমন ঠেকল ! চাল-চলন হাব-ভাব রূপ-জলুস—কিছুই মিল নেই ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। দিদিকে জিজ্ঞেস করলুম—দিদি, এটি ?

রাজলক্ষ্মী বলেছিল, এটি আমার ছোট মেয়ে।

সুন্দরী ঘাড় মুখ নেড়ে চোখ ডাগর ক'রে বললে, শেষ ফল এমনিই হয়। আমাদের ছোট-বোয়ের বলতে নেই সতেরটা বিয়েন, তার সব গিয়ে তিনটেয় ঠেকেছে। শেষ ফল এমনি দেখলুম।

পটলের মা বললে, লোকে বলে নাকি কায়েতের মেয়ে, সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন ! তা হ'লে কি হবে দিদি ? বামুন হয়ে তো আর জাত কুল খোয়াতে পারব না ?

সুন্দরী বামনী জোর গলায় বললে, তাতে আমার

আপত্তি নেই পটলের মা। একটা পাঁচালির ছড়া কাটলেন, এক টোপ দিয়ে আসব রাজলক্ষ্মীকে—মাল আর বেটী ঘরে রাখবার নয়, বিদেয় করতেই হবে।

কয়েক দিন পরে এসেও গেল সুন্দরী ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে, চৌকাঠের বার থেকে কান্না সুরু করলেন, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে। স্বর ছুটে যায় রাজলক্ষ্মীর কাণে, ছুটে এসে হাত ধ'রে নিয়ে যায়। কি হ'ল দিদি?

রাজলক্ষ্মী পান চিবুতে চিবুতে বললেন, যা হবার তা হয়ে গেছে, আমার ভাগ্যের দোষ, কি হ'ল, কি বুঝল—কিছুই বুঝতে পারলাম না। পাড়ার লোকে কত কি বলে, তাতে কাণ দিয়ে করব কি?

সুন্দরী কানা চোখের জল মুছে বললে, আমি ছুটে আসছি, দোষঘাট মাপ কর দিদি, ছেলেও আছে আর মেয়েও আছে, ঘর বজায় কর দিদি। পাড়ার লোকের রা বন্ধ ক'রে দাও—বিমলের সঙ্গে শান্তির বিয়ে দিয়ে।

তুমি কি শুনছ? যাও না, একটা সুখ-দুঃখের ভাল মন্দ কথা বলবার যো নেই, অমনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে! আর বলতে হবে না দিদি, আমি সব বুঝি, কর্ত্তার মত চাই তো?

শান্তি চ'লে গেল মুখ ভার ক'রে।

এক মুখ হেসে, কালো গালে টোল পড়িয়ে সুন্দরী বললে, মত তোমায় করাতেই হবে। ঘর বজায় করতে হবে শান্তির সঙ্গে বিমলের বিয়ে দিয়ে। আর একদিন আসব।—ব'লে চ'লে গেল।

শান্তি বইটি বন্ধ ক'রে বিছানায় ব'সে ভাবে। কি বিচিত্র, রামধনু রঙের মত, স্থায়ী হয় না কোন দিন, যেমনি আসে তেমনি মিলিয়ে যায় আকাশে। বাপ-মার স্নেহহীন জীবন, ভেসে যায় অগাধ সলিলে। প'ড়ে গেলে চেপে ধরে সকলেই, 'আহা' বলবার কেউ নেই।

নির্ম্মল ঘরে ঢুকে জানলা দিয়ে পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে, নভেল পড়ছিস তো? তোর আর কিচ্ছু হবে না, একেবারে ব'য়ে গেছিস। দেখি, কি বই পড়ছিস! হাত থেকে টেনে নিলে বইখানা, দেখলে, 'নবদুর্গা'। বললে, এ বই পড়তে শিখেছ? শোন একটা কথা। আমি, বড়দি, বড় জামাইবাবু কাশী যাচ্ছি, তুই যাবি?

শান্তি চুপ ক'রে থাকে।

কি? জবাব দিচ্ছিস না যে?

শান্তি বললে, আমি কি বলব, বাবা মা মত করেন তবে তো।

বড়দি সঙ্গে থাকবে, বাবা মা আপত্তি করবেন কেন ?

ভট্টাচার্য্য মশাই শান্তির মুখে শুনে, নির্ম্মলের সঙ্গে যেতে মানা করলেন।

রাজলক্ষ্মী নথটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, যাক না, রমিলা যাচ্ছে, বড় জামাই সঙ্গে থাকবে। নির্ম্মল তো আর একা নয়। যাও শান্তি, তোমার জিনিসপত্তর গোছগাছ ক'রে নাও।

রমিলা বাপকে বললে, শান্তি চলুক না, আমি তো আছি, আর তা ছাড়া উনি আছেন। ভয় কি ? নির্ম্মল কদিনই বা থাকবে ?

ভট্টাচার্য্য বললেন, যা ভাল বোঝ কর।

আজ তিন দিন হ'ল কাশী এসেছে। নির্ম্মল শান্তি বিশ্বনাথ দরশন ক'রে ফিরছে গলির মোড়ে সাড়া পেল।

নির্ম্মল, এটি কে ?

শান্তি ফিরে তাকায়, বুঝতে পারে না তার চাউনি। কাঁচা বয়সের স্ত্রীলোক, রুজ-পাউডার মেখে সাদা হয়েছে, সিল্ক শাড়ী-ব্লাউজের বাহার কম নয়। হাতে ব্রঞ্জের চুড়ি, গলায় মেকি সোনার হার, রিমলেশ চশমা, চোখের কোলে কাজল দিয়ে বিউটি বাড়িয়েছে। পায়ে জরির কাজ করা ভেলভেটের জুতো।

গোটাকতক ঢোক গিলে নির্ম্মল বললে, আমাদের কেউ নয়, মানে—শাস্তি।

আমাদের বাড়িতে চল, একটু বেড়িয়ে আসবে।

নির্ম্মল বললে, আর একদিন যাব, আজ নয়।

শাস্তি মুখ ভার ক'রে আপত্তি জানায়। ভাল লাগে না রাণীর চালচলন, বুঝতে পারে না চোখের ইসারা।

বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি।—ব'লে নির্ম্মল নিয়ে গেল রাণীর মহলে।

শাস্তিকে বসতে দেয় বিছানায়, ঘরে বাহিরে চলাফেরা করে, ঠেলাঠেলি করে আর আর মেয়েরা।

কালকের নিমন্ত্রণ নিয়ে বাড়ী ফিরেছে শাস্তি।

নির্ম্মল বললে, বড়দি জিজ্ঞেস করলে বলবি—নির্ম্মলদার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। কাল দশটার সময় যেতে বলেছে, বৈকাল চারটের সময় পৌঁছে দেবে।

শাস্তি বাড়ি ফিরে সাজানো কথার পুনরাবৃত্তি করলে বড়দির কাছে। নির্ম্মল সেই রাত্রে কলকাতায় রওনা হ'ল, বড়দিকে ব'লে গেল, শাস্তিকে নিতে এলে পাঠিয়ে দেবে। বৈকাল চারটের সময় দিয়ে যাবে।

রমিলা শাস্তিকে বললে, কই, নির্ম্মলের বন্ধুর বাড়ি থেকে তোকে এখনও নিতে এল না? দশটা বেজে গেল!

আমার যেতে ইচ্ছে নেই, কেমন কেমন লাগছে।—শাস্তি বললে।

নির্ম্মল রাগ করবে যে না গেলে।

গলির মোড়ে ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়ানোর শব্দ হ'ল। গাড়ী থেকে নেমে হাঁকডাক ক'রে রাণী বললে, চল, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

রমিলা বললে, এখন নিয়ে যাচ্ছ, চারটের মধ্যে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিও, নির্ম্মল এখানে নেই।

সাপের হাসি বেদেয় চেনে। হাঁয়ে হুঁ, নায়ে না—দিয়ে শান্তিকে গাড়ীতে তুললে, কোচমানকে বললে, জোর ক'রে গাড়ী চালাও। ভালবাসার বীজ ছড়িয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে রাণী বললে, উনি তোমার কে? নির্ম্মল তোমার ভাই নয়? আরও গোপন তত্ত্ব সংগ্রহ করতে ছাড়ে না।

উঁচু-নীচু রাস্তায় চাকা প'ড়ে দোলানিতে গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে রাণীর সঙ্গে। ঘটঘটানি শব্দ হয় গাড়ীর চাকার, চাবুক সাঁ-সাঁ শব্দে ঘোড়ার পিঠে পড়ে। গাড়ীর গতি বেড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

শান্তির অশান্তি বেড়ে যায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তে। পারে না অশান্তিকে দূর করতে, মুখে কালি পড়ে জলছবির পাতলা কাগজের মত, সহসা পারে না তাকে সরাতে জল দিয়ে। গলা শুকিয়ে যায়, কথা বলতে পারে না রাণীর সঙ্গে।

তোমার হ'ল কি শান্তি? রঙ কালি হয়ে গেল, মুখে বাক্যি নেই।—আধখানা দেহ গাড়ী থেকে বের ক'রে রাণী বললে, এই, এই, দাঁড়া, দাঁড়া।—গলার আওয়াজে রাস্তার লোক ফিরে চায় গাড়ীর দিকে।

হাত ধ'রে টেনে জোর করে নামাতে হ'ল শান্তিকে, ঘরে নিয়ে গিয়ে বসল। কত কি সুখের কথা শোনালে, গা-ভর্ত্তি গয়না, শাড়ী, গাড়ী।

শান্তি চুপ ক'রে ব'সে থাকে বিছানায়, ঘরের আব-হাওয়া তার ভাল লাগে না এক মুহূর্ত্ত। কথাবার্ত্তা হাব-ভাব ভদ্রোচিত মনে হয় না, বোধগম্য হয় না সব ব্যাপারটা। জানা নেই এ লাইনের রীতিনীতি। সময় কেটে যায়। চুপ ক'রে ব'সে থাকে, খাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ভয়ে ভয়ে রাণীকে বলে, বাড়ি যাব। বড়দি খোঁজা-খুঁজি করবে, জামাইবাবু রাগ করবেন, আমায় বাড়ি দিয়ে এস।

রাণী বললে, আচ্ছা, চল যাচ্ছি। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে একটা গাড়ীতে উঠল তারা দুজনে। ধিকিধিকি চলে কেরাচে গাড়ী, পারে না টানতে ছোট ঘোড়া দুটো। বড়-লোকের বাগান-বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়াল তাদের গাড়ী।

সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় রাণী, দাড়িতে ঠোকা দিয়ে সজাগ ক'রে বললে, রাজার হালে থাকবি, রাজ-ঐশর্য্য ভোগ করবি। দাস-দাসীদের হুকুম করবি বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

সদরে ঢুকে ডান দিকে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বারান্দা। চারিধারে ঢং-বেঢং ছবি, লোকজনের সাড়াশব্দ মোটেই নেই। বুঝতে পারে না শান্তি কোথায় নিয়ে এল

তাকে, বসিয়ে দিলে গদিপাতা পালঙ্কের ওপর। ছবির নগ্নতা দেখে ঘৃণায় ভ'রে উঠল মন, মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল।

লম্বা চওড়া ভবিষ্যুক্ত একজন লোক খাবার আর চা দিলেন রাত্রি এগারটার সময়, নাম জিজ্ঞেস করলেন ভদ্র-লোক।

শান্তি মিনতি ক'রে বললে, এ কোথায় আমায় নিয়ে এসেছে, দয়া করে বাড়ি পৌঁছে দিন না। দিদি জামাইবাবু খোঁজাখুঁজি করছেন, চারটের সময় ফেরবার কথা।

রাসবিহারীবাবু বারান্দায় একটু চলাফেরা ক'রে বললেন, বাড়ি চেন? একলা যেতে পারবে রাত্রি এগারটার সময়?

একটু আশ্বাস পেয়ে ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পারব। বড় রাস্তাটা পার হয়ে একটা গলি আছে, মুখে খাবারের দোকান, সেইখানে পৌঁছে দিন, বাড়ি চিনে নিতে পারব।

রাণীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া লেগে যায় রাসবিহারীবাবুর।

রাণী কর্কশ কঠিন স্বরে বললে, আমার জিনিস আমায় ফিরে তো দেবে?

চোখ বড় ক'রে জোর গলায় রাসবিহারীবাবু বললেন, না, না, জালিয়াৎ কোথাকার! গেট আউট।—ব'লে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন রাণীকে।

রমিলা ঘর-বার করছে, বড় জামাইবাবু ছুটোছুটি করছেন। স্ত্রীকে বকাবকি করছেন, কার বাড়ি পাঠাচ্ছ সে খোঁজটা তো নিতে হয়। জানা নেই, চেনা নেই, কার সঙ্গে পাঠালে মেয়েটাকে, কাশীর মত সহরে।

রমিলা বললে, নির্ম্মলের বন্ধুর বাড়ি গেছে, না পাঠালে নির্ম্মল রাগ করবে যে তাই। তাদের লোক নিয়ে গেছে, ব'লে গেছে—চারটার মধ্যে দিয়ে যাবে। বুঝতে পারছি না তো—কি হ'ল!

শান্তিকে ভবিষ্যতের আধার ক'রে রাখবে রাণী, টাকার থলি নিয়ে তবে ছাড়বে বাবুদের কাছে। ভবিষ্যতে নিজেকে দিয়ে আর কিবা হবে! জমিদারের কথামত সন্ধান ক'রে শিকার তুলেছে ঘরে।

কাঁদতে থাকে শান্তি তার জীবনের চরম মুহূর্ত্ত ভোগ ক'রে। পারে না সইতে অত্যাচারের ভার শিশুকাল হ'তে। সীমাহীন লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত দেহ তার। আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মোছে বারে বারে।

রাসবিহারীবাবু ছোট বড় দু কথা ব'লে, ছিনিয়ে নেয় শান্তিকে। একটা গাড়ী ডেকে উঠলেন। বসলেন দুজনে দুদিকে, কোন কথা নেই তাদের মধ্যে। গলির মোড়ে দাঁড়াল গাড়ী ঠুং ঠুং শব্দ ক'রে।

রমেনবাবু কাছে গিয়ে বলেন, এত দেরী হ'ল শান্তি?

ঘরের বাইরে থেকে বড়দিও দু কথা বলে রাসবিহারীবাবুকে।

শান্তি সব কথা বললে বড়দি আর রমেনবাবুকে।

রমিলা ভুল সংশোধন ক'রে নিলে। রাসবিহারীবাবুর প্রশংসা করলে তারা দুজনে। মাথায় হাত দিলে নির্ম্মলের নীচ ব্যবহারে।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পারুল আর শান্তির বিয়ের জন্যে। ঘটক-ঘটকী লাগিয়েছেন পাড়ায় পাড়ায়। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এলে বেশীর ভাগ দিন সেজেগুজে দাঁড়াতে হয় শান্তিকে। লোককে বলেন, পারুলের বিয়ে।

ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, শান্তির বিয়ে।

কাঞ্চন বন্ধুদের বলে, ছুজনারই তো পাত্র দেখা হচ্ছে।

দিনে তিনবার মেয়ে দেখতে আসে পাত্রপক্ষ। শান্তি-কেই বার বার দেখায়। উত্তরের জবাব দিতে হয় তাকেই। পায়ের দোষ আছে কিনা চ'লে প্রমাণ দিতে হয়। গা খুলে দেখাতে হয় বাড়ির গৃহিণীর কাছে। গানের স্থর, রান্নার তারিফ সেও পাসাবার যোটি নেই বরপক্ষের কাছে। কেউ কেউ নাড়ি টিপে বুঝে নেয় গোপন রহস্য।

পারুলকেও সাজতে হয় কোন কোন লোকের মনোরঞ্জন করবার জন্যে, পারে না খুশি করতে তাদের, যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় তখনি।

পাশের বাড়ির বিন্দুর পিসি বললেন, কি গো লক্ষ্মী, তোমার শান্তির বিয়ে নাকি? কবে হচ্ছে? ছেলেটি কেমন? পারুল রইল বুঝি?

রাজলক্ষ্মী মুখ বাড়িয়ে বললেন, ছুজনের একসঙ্গে দেব মনে করেছি। বড় তো হয়েছে, মেয়ে তো ঘরে রাখবার নয় দিদি।

বিনয় খাতির ক'রে নিয়ে আসে বরপক্ষের লোকদের।

রাজলক্ষ্মী বললেন শান্তিকে, চুলগুলো একটু গোছ ক'রে নাও। রঙ-চঙে শাড়ি প'রে, মুখে রঙ চড়িয়ে দরকার নেই।

বরপক্ষ শান্তিকে দেখে, গলার সাড়া নিয়ে, সায় দিয়ে

চ'লে গেল, বেশী কথা জিজ্ঞেস করলে না। দেনা-পাওনার হিসাব গোপন রইল কর্ত্তাদের কাছে।

বিয়ের দিন ঠিক হ'ল। মাত্র সাত দিন দেরি আছে। আয়োজন হতে লাগল বিবাহের। রাজলক্ষ্মী জাল, কাঁটা, ফিতে কিনে দেয় পারুলকে।

ভট্টাচার্য্য নির্লিপ্ত, নিস্পন্দ ব'সে আছেন, মাঝে মাঝে ডাকেন শান্তিকে।

বিবাহের দিন উপস্থিত হয়েছে, আয়োজন সম্পূর্ণ, রাজলক্ষ্মী ছুটাছুটি করছেন, হাঁকাহাঁকি করছেন,—কি রে রবিন, তোর বড়দি এল না? শোভা, তোমার মা এলেন না? চ'লে যেও না যেন না খেয়ে।

শোভা বললে, ক'নে কোথা? শান্তি?

রমিলা বললে, ঐ দেখ না বিয়ের নামে ভয় পেয়েছে। বাবার ঘরে লুকিয়ে আছে। পারুল, তোর বন্ধুরা এখনও কেউ এল না? কাপড়খানা বদলে ফেল্।

রাজলক্ষ্মী হালুইকর বামুনকে বললেন, তরকারিতে লঙ্কার ভাগটা একটু বেশী ক'রে দেবেন। লবণ হাতে রেখে দেবেন। হালুয়ার সুজিটা পেয়েছেন?

কুশী এসে বললে, শান্তির কাজললতা?

তোমায় কে বলেছে সরদারি করতে? কনে সাজানোর নামডাক তো খুব আছে, পারুলকে সাজিয়ে দাও দেখি চন্দন দিয়ে।

কুশী দাঁড়িয়ে থাকে চুপ ক'রে।

কোন্‌দিক সামলাই! যেটা না দেখব সেইটেই হবে না।—ওপর থেকে হাঁক দেয় রাজলক্ষ্মী, বরণডালার সঙ্গে লাল শাড়ীখানা রেখো বৌমা। বিয়ের সময় দরকার হবে। বিন্দুর মা, তুমি শেষ পর্য্যন্ত একটু থেকো। কি খাচ্ছিস রে পরাণ?

এক মুখ মিষ্টি পুরে কাশতে থাকে পরাণ।

রাজলক্ষ্মী বললেন, শাঁখটা ঠিক ক'রে রেখো, বর এলে বাজাতে হবে। বাসর ঘরে তোমরা কেউ থেকো না, আগে থেকে মানা ক'রে দিচ্ছি।

হালুইকর ঠাকুর সুবিধে বুঝে কুশীর কাছে গিয়ে বললে, তোমার জন্যে ও-বেলাকার বড় মাছের মুড়োটা রেখেছি। আর মাছের ডিম।

হাসি চেপে এদিক ওদিক দেখে চোখের ভাষায় জবাব দিয়ে স'রে প'ড়ে সেখান থেকে কুশী।

কন্যাপক্ষ বরের আসার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, ছোট ছেলেমেয়েরা চিৎকার করলে—বর আসছে। ছুটে আসে যুবতীর দল, শান্তির হাত ধ'রে টানাটানি করে বন্ধুরা, বলে—বর দেখবি আয়। শাঁখ বেজে ওঠে ভিতর থেকে।

জ্বলন্ত চোখ বার ক'রে গাড়ীখানা আসছে এদিকে। শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে ভিতর-বাড়ি থেকে।

কাঞ্চন দাঁড়িয়ে আছে সদরে, বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা

করবার জন্যে, বরকে ধ'রে বসাবে বরাসনে। গাড়ীখানা দাঁড়াল বিয়ে-বাড়ি দেখে, গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বের ক'রে এক ভদ্রলোক বললেন, এটা কি দত্ত-বাড়ি?

ঐ গলিটার ভেতর দত্ত-বাড়ি।—হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলে কাঞ্চন। হো-হো ক'রে চিৎকার করে ছেলের দল।

ভট্টাচার্য্য মশাই শাস্তিকে আড়ালে রেখেছেন, উৎসবের আনন্দ স্পর্শ করতে না পারে তাদের। কোন আনন্দধ্বনি না পৌঁছয় সেখানে।

বর এল, শাঁখ বাজল, উলু দিল মেয়ের দল। বরযাত্রীদের আদর-অভ্যর্থনা ক'রে ছাতে তোলা হ'ল, সানাই বাজল বাবুদের ফরমায়েস মত।

কাঞ্চন বললে, এই যে বিপিনবাবু, কেমন হ'ল?

বিপিনবাবু বললেন, যে খাওয়া খাইয়েছেন, বিয়েবাড়ি এ রকম অনেক দিন খাই নি। চাটনির পরে দই দিয়ে পথ দেখিয়ে দেয়। বিয়ের লগ্ন কটায়?

এগারটার পর, তিনটের মধ্যে।

তবে আর বিয়ে দেখা হ'ল না, আমায় আবার যেতে হবে অনেক দূর।

অনেকেই চ'লে গেলেন খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে, বর-পক্ষের কয়েক জন মাতব্বর আর বরের ভাই ভাগনে বন্ধু এরাই রইল বিয়ে দেখবার জন্যে।

হীরালালবাবু বললেন, বিয়ের আর দেরি কি? কাজ-

কর্ম্ম তো এক রকম মিটে গেছে, লগ্ন ব'য়ে যায় মিছে দেরি কেন? দেখ তো হেম।

হেম নাপিত বললে, ক'নে কাপড় ছাড়ছে, কৌটা-চন্দন পরছে। এখনি আসবে, দেরি হবে না।

ক'নে এসে বসল বিয়ের পিঁড়িতে, বর বসল সামনে। পুরুত ঠাকুর দুজনের হাত ধ'রে বললেন, হাতে হাত দাও তো বাবা। দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দেন পুরুত ঠাকুর। কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে থাকে পারুল, বরপক্ষের লোক কানাঘুষো করছে মেয়ে দেখে। সুন্দরী কুৎসিতের সমালোচনায় মুখরিত হ'ল বিবাহের আসর।

প্রফুল্ল উঠে পড়ে বিয়ের পিঁড়ি থেকে, জোর গলায় বললে, এ মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয় নি। আমি এ বিয়ে করব না। সুন্দরী দেখিয়ে কালা পেঁচি গছিয়ে দেবে—সে ছেলে আমি নয়।

উচ্চ কলরবে মুখরিত হ'ল বিয়ের আসর। বাক্‌যুদ্ধ লেগে গেল দলেদলে। অন্তঃপুর মুখরিত করলেন রাজলক্ষ্মী।

রমিলা প্রফুল্লকে বললে, শান্তির কথা বলছ? ও এক জটিল রহস্য, ও যে কায়েত। ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে কি ক'রে হতে পারে? বামুন কায়েতে বিয়ে দিয়ে আমরা তো পতিত হতে পারি না? পারুল বোন আমার যেমনি ধীর তেমনি নম্র, কাজকর্ম্ম ভালই জানে, লেখাপড়া বেশী নাই বা শিখল, বামুন পুরুতের মেয়ে এর বেশী দরকারই বা কি?

পাশ থেকে রাজলক্ষ্মী বললেন, এই আমার কথাই ধর না, নেকাপড়া শিখি নি. কিন্তু কেউ ঠকিয়ে নিক দিকি নি এক পয়সা। গণ্ডা গণ্ডা ক'রে টাকা গুনব, হিসেব আমায় বুঝিয়ে দিতেই হবে।

চিন্তায় মাথা নুইয়ে পড়ল, লাঠিতে ভর দিয়ে ব'সে রইলেন হারাণবাবু। ছেলের বিয়ে দিতে এসে ফিরে যাওয়া সেও কম লজ্জার কথা নয়। লোকসমাজে বন্ধুবান্ধবের কাছে মুখ দেখাবেন কি ক'রে? বিশেষ ক'রে রামহরি ভট্টাচার্য্য এ রকম ঠকাবেন ভাবতে পারেন নি হারাণবাবু।

প্রফুল্লর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল বন্ধুদের কাছে, সে যে সকালে তর্ক ক'রে এসেছে—দেখবি, দেখবি, বউ কাকে বলে! তাদের কাছে এ বউ দেখাবে কি ক'রে?: ফিরে গেলে সমাজের লোক হাসবে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখানো দায় হবে।

ভট্টাচার্য্য মশাই শান্তিকে বুকে ক'রে কাঁদতে লাগলেন, তাঁর কৃতকার্য্যের জন্য দায়ী কে? শান্তি বিয়ের রাতে ঘরে আবদ্ধ হয়ে রইল। রাজলক্ষ্মীর কড়া হুকুম মেনে চলতে হবে। বুঝতে পারে না মায়ের চাল বুঝতে পারে না ভাগ্যের পরিহাস।

ভট্টাচার্য্য বললেন, শান্তি, তোর ওপর কত অন্যায় অবিচার ক'রে এসেছি তার ক্ষমা নেই। তোর কাছে ক্ষমা পেলেও ভগবান রেহাই দেবেন না আমাকে। শেষ বয়সে অনেক কিছু আছে আমার ভাগ্যে।

বরপক্ষের পুরুতঠাকুর ঘড়ি দেখে বললেন, লগ্ন শেষ হতে মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি আছে, যা হয় একটা যুক্তি স্থির করুন।

চার ঘণ্টা বাক্‌যুদ্ধের পর পারুলের সঙ্গে প্রফুল্লর বিয়ে হয়ে গেল। রূপকথার রাজকুমারীর মত।

রাজলক্ষ্মী প্রফুল্লকে দেখতে দিলে না শান্তিকে, অশান্তি-পূর্ণ বিবাহ-উৎসব সমাধা হয়ে গেল। পরের দিন মুখভার ক'রে বউ নিয়ে গেল প্রফুল্ল। রাজলক্ষ্মী কর্ত্তার ঘরে ঢুকে একপাতা সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দেয় শান্তিকে। শান্তির কোন কথাই শুনলেন না রাজলক্ষ্মী। বললেন, আজ থেকে রোজ নিয়মমত সিঁদুর পরবে। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবে—আমার বিয়ে হয়ে গেছে। যদি বলে—জামাই কোথা? বলবে—তিনি রেলে চাকরি করেন, গৌহাটীতে কোয়ার্টার পেয়েছেন, শিগগির নিয়ে যাবেন। স্থায়ী চাকরি তো নয়, ছুটাছুটি করতে হয় বাইরে বাইরে।

রামহরি ভট্টাচার্য্য স্ত্রীর ওপর কথা বলতে অক্ষম, উকিলের জেরা আর দাবার চাল কিছুই জানেন না তিনি। ঘৃণায় লজ্জায় স্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারে উঁচু মাথা নীচু হয়ে গেল।

শান্তি ব'সে থাকে চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে, জীবনে আর কত কি খেলা খেলতে হবে তাইবা কে জানে! মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল গলায় কাঁটা বেঁধার মত। রহস্যময় জীবন! মৃত্তিকার ওপর ঘাস যে পায় দ'লে যায়। পিষে ফেলে পায়ের দাপটে।

শান্তি এখন ক্লাস টেনের ছাত্রী, স্কুল গেছে সিঁদুর মাথায় দিয়ে, মুছতে পারে না মায়ের কড়া শাসনের ভয়ে। শীলা কল্যাণী হাসির রোল তুলে দিলে তাকে দেখে।

কল্যাণী বললে, আরে, শান্তির মাথায় সিঁদুর কেন? কিছুই জানতে পারি নি, শান্তি বিয়ে ক'রে পতিদেবতাকে মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছে।

শীলা ঠোকা মেরে বললে, কি রে শান্তি, তুই যে বলে-ছিলি—বিয়ে করবি না, বিয়ের নামে নাক সেঁটকাতিস? তোর মত মেয়ের কাছে এ রকম আশা করতে পারি নে। বুক থেকে পেনটা তুলে নিয়ে বললে, বুকের মধ্যে আছে নাকি পতিদেবতার ছবি-টবি? রসে ভরা, মধু মাখা, গন্ধে ভরা গোপন চিঠি? একবার খবর পেলে তোর বরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিতেম। আমাদের দল ভেঙে দিলেন তিনি!

আমার ইচ্ছে ছিল, শান্তির বিয়েতে থোকার মালা দেব, আর নয়তো—। ব'লে মুখে চাপা দিয়ে হাসতে লাগল কল্যাণী।

আমার বিয়ে আমিই জানি না, বিশ্বাস কর্ তোরা।

তিনি করেন কি?—শীলা বললে।

কল্যাণী বললে, রেসের টিপ যোগাড় করেন, আর নয় তো দালালী করেন, ডাক্তার উকিল নয় নিশ্চয়।

কোন উত্তর না দিয়ে একটা ঘাসের ডগা চিবুতে লাগল শান্তি। শুনতে পায় না বন্ধুদের পরিহাস। ধাক্কা দিয়ে সাড়া পায় না কল্যাণী।

তোর আজ হ'ল কি বল্ তো?

ক্লাস বসার ঘণ্টা পড়ল, উঠে গেল সকলে। ক্লাসের মিস্ট্রেস শান্তির সীমন্তে সিঁদুর দেখে বললেন, শান্তি, হঠাৎ তোমার এ পরিবর্ত্তন ঘটল কি ক'রে? আমরা তো কিছুই জানতে পারি নি! তোমার কাছে আমাদের অনেক আশা ছিল, সব নিরাশ করলে তুমি বিয়ে ক'রে। তিনি করেন কি? থাকেন কোথায়? তোমায় উপার্জ্জন ক'রে তাকে খাওয়াতে হবে না নিশ্চয়?

শান্তি কথা বলতে পারে না, বারকতক ঢোক গিলে, মুখ নীচু ক'রে বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল। একটা মিথ্যে ঢাকতে গিয়ে দশটা মিথ্যে বলতে হয়।

মেয়েরা সব মুখের দিকে চেয়ে থাকে উত্তর শোনবার জন্যে।

চুপ ক'রে রইলে যে? ব্যাপার কি? বল তো?—মিস্ট্রেস বললেন।

শান্তি মাথা নীচু ক'রে বললে, উনি রেলে চাকরি করেন, পরে আমায় নিয়ে যাবেন বলেছেন। থাকার ঠিক নেই তাই।

অম্বরনাথের মতো বিয়ে হয় নি তো?—কল্যাণী বললে।

শান্তি উত্তর দেয় না সব কথার—বিবেকে বাধে সত্যের বিরুদ্ধে সায় দিতে। পারে না সত্য ব'লে লোক হাসাতে।

দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেল। শান্তি নলডাঙা থেকে এসে দেখলে, তাদের সামনের ফ্ল্যাট-বাড়িটাতে লোক এসেছে। একটি ঘরে জন তিনেক লোক।

শান্তি জিজ্ঞাসা করে কুশীকে, ঐ বাড়ীতে লোক এসেছে?

কুশী আঁচলটা ফিরিয়ে বললে, হ্যাঁ, চার-পাঁচ দিন হ'ল লোক এসেছে, কিন্তু লোকগুলো দিদিমণি—

থাক্, আর বলতে হবে না। শান্তি দেখে তার ঘরের দিকে একজন চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। চোখে চোখে ধাক্কা লাগল, ফিরে এসে শুয়ে পড়ল বালিশটা চেপে ধ'রে। অল্প ঘায়ে ভেঙে গেল, কাচের বাসনে ঠোকা লাগার মত। হঠাৎ মনটা কেমন হয়ে গেল, নেমে গেল সেখান থেকে। ওপর ঘরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যায়, লোকটা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার ঘরের দিকে, কম ক'রে সাত বার ঠোকাঠুকি লাগে চোখে চোখে। ঘরে যায়, দোরটা বন্ধ ক'রে দেয়, বাতি নিবিয়ে দেয় তখনকার মত। শান্তি ভাবে, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে এক ভাবে কি দেখে, কি আছে

আমার মধ্যে? আর আমারই বা কেন বার বার তাকাতে ইচ্ছে করে? আমার মন তো এ রকম ছিল না! আমার মা-বাবার কথা ছাড়া আর কারও কথা মনের মধ্যে হয় না। কত লোক আমার দিকে তাকিয়েছে, কিন্তু কই, তাদের দিকে তো আমি একবারও তাকাই নি বা ভাবি নি। এই দেখা-দেখির মধ্যে কয়েক দিন কেটে গেল। মনের কাঁটা ফেলতে পারে না শান্তি, স্থির হয়ে বসতে পারে না। তু-দণ্ড, আচমকা চোখ দুটো চ'লে যায় সামনের বাড়ির জানলায়। চোখ ফিরিয়ে নেয় লোকটাকে দেখে।

প্রফুল্ল পারুলকে সঙ্গে ক'রে শ্বশুরালয় এসেছে জামাই-ষষ্ঠীর দিনে। র'য়ে গেছে সে দিন। পরের দিন গা এলিয়ে শুয়ে আছে দোতলার ভিতরের ঘরে জানলা বন্ধ ক'রে। আলোর চেয়ে আঁধার ভাবটাই বেশী সে ঘরটাতে।

রাজলক্ষ্মী নীচে থেকে শান্তিকে খেতে ডাকেন।

শান্তি ছাদ থেকে উত্তর দেয়, যাই মা। ব'লে নিজের জামা সায়া শাড়ী রোদ থেকে তুলে ভাঁজ ক'রে ঘরে রাখতে গেছে।

প্রফুল্ল সুযোগ বুঝে উঠে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে,

হাতটা চেপে ধ'রে শান্তিকে বললে, দু মিনিট—বিশেষ দরকার আছে। দরজায় পিঠ দিয়ে আগলে দাঁড়াল প্রফুল্ল। সেদিন কোথায় ছিলে, দেখি নি তো একবারও তোমাকে? ভয় দেখায়, ভালবাসার গল্প শোনায়, তোমার তরে সোনার তরি ভাসিয়ে দেব শান্তিলতার শান্তি জলে। তোমায় নিয়ে চ'লে যাব,—দূরে, অনেক দূরে। পার না? পার না শান্তি, তুমি আমাকে ভালবাসতে—

পাষণ্ডের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে চিৎকার করে শান্তি। খিল পড়ার শব্দ হ'ল, দরজা খুলে গেল। শান্তির লাল মুখে কালি পড়েছে এই সব নোংরা কথা শুনে। শাড়ীর আঁচল খ'সে পড়েছে মাটিতে, চুলের গোছা ছড়িয়ে পড়েছে সামনে পিছনে। থরথর ক'রে কাঁপছে পা দুটো।

দরজা খোলার অপেক্ষায় আছে রাজলক্ষ্মী, পারুল, কুশী।

প্রফুল্ল ব্যস্ত হয়ে শান্তির আগে এসে বললে, মা, আমি ঘরে শুয়ে আছি, শান্তি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে কি সব বলছে!—পার না? তুমি আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে? দূরে—অনেক দূরে, যেখানে লোকগঞ্জনা পৌঁছবে না। বেশ একটি ছোট্ট ঘর বেঁধে থাকব তুমি আর আমি।

রাজলক্ষ্মী কাপড়ের ডগাটা কোমরে জড়িয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে বললেন, হারামজাদী, পারুলের সর্ব্বনাশ করছ? লোকের মুখ বন্ধ করব কি ক'রে? দশজনে দশ কথা বলবে

না? তোমার পেটে পেটে এত বিদ্যে! কুশী, নিয়ে আয় তো ভিজে গামছাখানা, ঘা কতক দি।

পারুল মড়াকান্না জুড়ে দিলে, লোক জড়ো হ'ল সদরে—ও গো, আমার কি হ'ল গো! তোর মনে এই ছিল?

শান্তির কথা ফোটে না মুখ থেকে। চেয়ে থাকে পারুলের বর রাজলক্ষ্মীর ছোট জামাই প্রফুল্লের দিকে।

রাজলক্ষ্মী হুকুম করলেন কুশীকে, দশ ঘা গুনে ভিজে গামছা পেটা ক'রে ছাদে তুলে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়। দাঁতে দাঁত দিয়ে বললেন, ভাতের বদলে ছাই দেব। তোমার রোগের ওষুধ দিচ্ছি।

কুশী: স'রে দাঁড়িয়ে বললে, আমি পারব না মা-ঠাকরণ, ও-গায়ে ভিজে গামছা পেটাতে।

রাজলক্ষ্মীর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, এদিক ওদিক চান চোখ বড় ক'রে।

হরি ঝি দাঁতে দাঁত দিয়ে এগিয়ে এসে বললে, দাও না আমাকে, ঘা কতক পিটিয়ে বিষটা নাবিয়ে দি। তবে লো হারামজাদী!—ব'লে কোমরে জড়িয়ে নিলে কাপড়টা। তোর পেটে এত বিদ্যে, নেকাপড়া শিখে বিয়ে ক'রে আবার একজনের কপাল ভাঙছ! কত আর দেখব! দিন যায় কথা রয়। গামছার ঘা পড়ে শান্তির পিঠে, গুনতে থাকেন রাজলক্ষ্মী, নিঃশব্দে সহ্য করে শান্তি। পারে না দেহটাকে খাড়া রাখতে, লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, জামাই আমার সে রকম নয়, ওর চরিত্তির দোষ দেয় কে ?

হরি গামছার ঘা শেষ করে। সাদা চামড়া লাল হয়ে গেল, ছিঁড়ে গেল স্থানে স্থানে। লাঞ্ছনার শেষ হয় না। আপন মনে কাঁদে আর ডাকে ভগবানকে।

ভট্টাচার্য্য মশাই কান্না শুনে ব্যস্ত হয়ে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, অনাথ মেয়েটাকে তোরা মেরে ফেল্। কাটা ঘায়ে নুন ছিটিয়ে কি হবে, মুখে বিষ ঢেলে দে, সব জুড়িয়ে যাবে। হাত ধ'রে তুলে কাছে টেনে স্নেহভরে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। গলার স্বর কেঁপে উঠল, হায় ভগবান! কুশী, একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দে, ওর কেবা আছে আর কার হাতে তুলে দেব! নারায়ণ! ভগবান!—ব'লে দেহটাকে কাঁপিয়ে চ'লে গেলেন।

কুশী স্নেহভরে মিষ্টি কথা ব'লে সান্ত্বনা দেয় শান্তিকে। আর বলে, তোমাদেরই তো সব ঐ, যা দেখছ—খাট, আলমারি, টেবিল। বড় ছবিগুলো ঘুঁটে-কয়লার ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। তোমাকে দেখতে দেবে না ব'লে।

শান্তি কথা বলে না, চোখ মেলে চায়, নিশ্বাস ফেলে বড় ক'রে।

কুশী বললে, চুপ ক'রে শুয়ে থাক, শরীর একটু সুস্থ হোক। তোমার বাড়ি ঘর বিক্রি ক'রে দু মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। আর বড়বাবু কিছু টাকা হাত করেছে।

তুই জানলি কি ক'রে ?

কেন, মা বড়বাবুর ঝগড়ার মুখে শুনেছি।

শান্তি বললে, কি বললি কুশী ? গলার স্বর চাপা, ক্ষীণ তার আওয়াজ। পারে না জোর ক'রে কথা বলতে, পারে না খাড়া রাখতে দেহটাকে।

কুশী স্নেহ দিয়ে সেবা ক'রে তোলে বিছানা থেকে।

রাজলক্ষ্মী কাজের অবসরে গাল পাড়ে শান্তিকে, মরল না! ম'লেও তো বাঁচতুম। দিন দিন খাচ্ছে আর ফুলছে। পারুলের কি সর্ব্বনাশটাই না করতে বসেছিল! ভাল জামাই, তাই—

হরি ঝি সায় দেয় সে কথায়, সে কথা আর বলতে মা।—এক মুখ হাসি ছড়িয়ে—কাঁটা মাছ বেছে খেতে জানে না।—চোখ দুটো বড় ক'রে বললে, দেবতা, দেবতা আর কাকে বলে। সাক্ষাৎ দেবতা।

সেদিন ঘর থেকে বের হবে, সামনের বাড়ির জানলায় চোখ পড়ল। ভদ্রলোক ব'সে আছে, ইসারা ক'রে তাকে কি বলছে! চেয়ে থাকে শান্তি, বুঝতে চেষ্টা করে তার কথা। ইসারা ক'রে দেখিয়ে দেয়, এক টুকরো কাগজ। তার ঘরের সামনের ছাদে প'ড়ে আছে।

এদিক ওদিক দেখে কুড়িয়ে নেয় শান্তি, পড়তে থাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে।

ছোট্ট কাগজ, অল্প লেখা—তোমার কথা জানতে ইচ্ছা হয়, জানাবে কি ?

শান্তি ভাবে, তার কথা জানতে চায় কেন? কি সে জানাবে? সে যে ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সে তার জীবনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না। কত ঝড় মাথার ওপর দিয়ে গেছে, কারুর কাছে কোন কথা বলে নি আজ পর্য্যন্ত। বার বার উত্তরের তাগিদ আসে চোখের ইসারায়। ভাবে শান্তি, সত্য গোপন ক'রে মিথ্যা লিখে পাঠাবে। ওরা যা ব'লে বেড়ায়—স্বামী নেয় না, শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করেছে। কত চিঠি লিখল, কোনটাই মনে সায় দিল না। প্রতিজ্ঞা তার রক্ষা হ'ল না—মিথ্যের আশ্রয় মেনে নিতে পারল না। তার জীবনের সত্য ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দিল কুশীর হাত দিয়ে।

লীলাবতী একটু স'রে গিয়ে বললে, শান্তির মায়ের জড়োয়ার গয়নাগুলো আমার চাই।

কাঞ্চন বললে, হাতে আসুক, তারপর তো চাই।

লীলাবতী দূরে স'রে গিয়ে, মুখ ভার ক'রে জানলার গরাদ ধ'রে মুখ ফিরিয়ে বললে, তুমি তো সাত বছর ধ'রে ছক পাতছ আর জাল বুনছ, কত আশাই না দিয়ে রেখেছ আমাকে—শান্তির মায়ের জড়োয়ার গয়না তোমার গায়ে

ওঠাব। আর কবে দেবে? ম'রে গেলে, না, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই ঘরে এলে গা-ভর্ত্তি গয়না প'রে ঘুরে বেড়াব?

কাঞ্চন এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক দেখে বললে, সব ঠিক করেছি। এখন একটা উপায় ক'রে মা-বাবাকে একবার বের করতে পারলে হয় বাড়ি থেকে।

লীলাবতী বললে, তার আর ভাবনা কি! ওদের কালী-ঘাটে মাকে দর্শন করিয়ে নিয়ে এস না।

কাঞ্চন কোন কথা না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাকে বললে, অনেক দিন কালীঘাট যাওয়া হয় নি, চল, কালকে মাকে দর্শন ক'রে আসি।

রাজলক্ষ্মী সায় দেয় সে কথায়।

কাঞ্চন সব ঠিক ক'রে লীলাবতীকে সজাগ থাকতে ব'লে যাত্রা করলে কালীঘাটের দিকে। ভট্টাচার্য্য, রাজলক্ষ্মী, শান্তি কেউই রইল না বাড়িতে।

সময় বুঝে বাক্স ভেঙে চুরি হয়ে গেল শান্তির মায়ের গচ্ছিত জড়োয়ার গয়না।

বাড়ি ফিরে এসে রামহরি ভট্টাচার্য্য মাথায় হাত দিলেন, রাজলক্ষ্মী গয়নার শোকে ভেঙে পড়ল। বিনয় ছুটে গিয়ে

খবর দিলে পুলিসের দপ্তরে। শান্তি বাপের ঘরে নির্বাক হয়ে ব'সে রইল। বুঝতে পারল না এদের অভিসন্ধি এতটুকু। দেখাশোনা ক'রে পুলিসের লোক ব'লে গেলেন, এ চুরি ঘরের লোক করেছে, বাইরের চোর এভাবে চুরি করতে পারে না। কেসটা লেখা হ'ল পুলিসের খাতাতে।

বিনয়ের একান্ত চেষ্টায় চুরির মাল ধরা পড়ল। বড়দার ঘরে বড় বৌয়ের হাতের মধ্যে চ'লে গেছে তখন। বিনয় মা-বাবাকে বললে, বড়দা লোক লাগিয়ে এ কাজ করেছে। চোর ধরাও পড়ল, কবুল দিলে সব কিছু। ঘরের চুরি ঘরের লোক করেছে, কি প্রমাণ করবে লোকের কাছে! এইখানেই শেষ করে চুরির কেসটা।

রামহরি ভট্টাচার্য্য আর সহ্য করতে পারেন না সংসারের জাল-জুয়াচুরি। বুকের ব্যথা বেড়ে ওঠে বারে বারে, দুই হাতে চেপে ধরেন বুকটা। যন্ত্রণার ভাব ফুটে ওঠে সারা মুখখানায়।

শান্তি ওষুধের শিশিটা রেখে বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। আর বলে, একটু চুপ ক'রে থাক বাবা, এখুনি ব্যথা ক'মে যাবে।

ভট্টাচার্য্য বললেন, মা আমার অন্নপূর্ণা! শান্তি, তোর ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না—না না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার চাই। শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

শান্তি ওষুধের মোড়কটা খুলে মুখে ফেলে দেয়, আর একটু জল। বলে, একটু স্থির হও, ব্যথা ক'মে যাবে।

যাবে—যাবে—একেবারে ক'মে যাবে। তুই আমার কাছে আয়, আমার কেমন ভয় করে, ওরা তোকে খুন করবে, খুন করবে।—ব'কে যান আবোল-তাবোল।

পাশের বাড়ির বিনুর মা বললেন, কে? শান্তি?

হ্যাঁ কাকিমা, আমি।

বিনুর মা বললেন, হ্যাঁরে, এতদিন যে তোর বিয়ে হ'ল, জামাইকে তো একদিনও দেখলুম না, তোকে শ্বশুর বাড়িতে যেতে দেখলুম না একদিনও! এ কি রকম বিয়ে তোর হ'ল বল্ তো?

শান্তি ভাঙা মন জোড়া দিয়ে, হাসিমুখে বললে, কি ক'রে আসবেন বলুন? বড় কোম্পানির চাকরি করেন, আজ এ-মুলুক, কাল ও-মলুক ক'রে বেড়াতে হয়, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসলে তবে তো আমায় নিয়ে যাবেন। লিখে-ছেন—শিগগির আসবেন।

বিনুর মা গালে হাত দিয়ে, চোখ কপালে তুলে বললেন, আমার যেন কেমন কেমন ঠেকে বাছা, তোর ভাব গতিক দেখে! এতখানি বয়েস হ'ল বাছা, চোখে তো দেখি নি, কানেও শুনি নি এমনটি।

ও-দিকে কার গলা শুনে শান্তি ইসারায় জানালে, আমি যাচ্ছি কাকিমা।

হাঁকডাক ক'রে বাড়ি ঢুকে সুন্দরী বললেন, কই গো, দিদি কই গো? দম বন্ধ হয়ে মরছি দিদির সঙ্গে দুটো কথা বলতে না পেয়ে, কত লোকে কত কথাই না বলে!

রাজলক্ষ্মী বললেন, কি হয়েছে তাই বলুন?

সুন্দরী আঁচল দিয়ে মাটি ঝেড়ে বসলেন। বললেন, বিমলকে রাজী করিয়েছি। সে কি রাজী হয় দিদি, একান্ত আমার অনুগত তাই। মায়ের কথার ওপর রা'টি করে না, সে কথা ভুলে যাও দিদি, ভুলে যাও, কি যে হ'ল দিদি, লোকে আমাদের মা-বেটার গায়ে কালি লাগিয়ে দিলে।— চোখে কাপড় দিয়ে জল মুছতে লাগল।

রাজলক্ষ্মী একটা বড় ক'রে নিশ্বাস ফেলে বললেন, দোব দিদি, দোব, শান্তি তোমার ওখানেই থাকবে, ঘর বজায় হবে। বিমল তো আমার পর নয়।

সুন্দরী মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে বললেন, দাও দিদি, দাও। ব'লে এক জোড়া পান তুলে নিয়ে মুখে পুরে বললে, নতুন কুটুমবাড়ির একটা পান খেয়ে যাই। বিমলের বউ

হয়ে থাকবে। আর একটা বেটা নেই, একটা বেটীও নেই। দুটোতে বেশ থাকবে। মিলবে ভাল ওদের দুজনে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, আমি লোকের কাছে বলেছি, জামাই রেলে কাজ করে, কখন কোথায় থাকে ঠিক নেই। এখন বলব—জামাই নিয়ে গেছে শান্তিকে।

তা হ'লে দিদি গোড়া বেঁধে কাজ করেছ?

বিনয় সাড়া দিলে মাকে। শান্তি স'রে গেল সব কথা শুনে, ভয় হতে লাগল। ওরাই তো মেজদিকে গলা টিপে মেরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। চায়ের কাপটা প'ড়ে গেল শান্তির হাত থেকে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, ভেঙেছ নতুন কাপটা! একে টানা-টানির সংসার, তার ওপর হারানো ভাঙা নিত্য লেগেই আছে, মানুষ পারে কখনও!

শান্তি চ'লে যায় তেতালার ঘরে। বুকে বালিশ চেপে, না খেয়ে প'ড়ে রইল সে রাত্রি বিছানা কামড়ে। চেয়ে দেখে, দূরে জানলায় লোকটা ইসারায় কি বলছে। বুঝতে চেষ্টা করে শান্তি। বুঝতে পারল—একদিন দেখা করতে চায় সময়মত।

তার পরদিন সময়মত দেখা হ'ল নির্দ্দিষ্ট স্থানে।

সব কথা শুনে, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সতীশ বললে, এখন কি করবে? ঐ ভাবে প'ড়ে থেকে অত্যাচার সহ্য করবে, এর কি কিছুই প্রতিকার করবে না?

শান্তি মুখ নীচু ক'রে বাঁ হাতে কাপড়ের ডগাটা জড়াতে জড়াতে বললে, কি করব, কোথায় যাব, আপনার বলতে কে আছে জানি না। মাথার ওপর কেউ নেই, যার দ্বারা কিছু করতে পারব। আর ঐ বাড়িতে থেকে কিছু করতে পারা সম্ভবও নয়, তাতে আরো বিপদ আছে।

সতীশ বললে, ও-বাড়ি থেকে তুমি চ'লে এস, আমি তোমার পিছনে আছি, আমি তোমায় সাহায্য করব।

প্রতিবাদ জানায় শান্তি—যা হয় না, তা নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক নয়। আপনি বিবাহিত, ছেলে মেয়ে আছে। আপনাকে ভালবাসার অধিকার আমার থাকতে পারে, কিন্তু আর কোন কামনা করা আমার উচিত নয়। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যায়, বাড়ি চ'লে আসে। না খেয়ে বিছানায় শুয়ে কত কি ভাবে—কুল-কিনারা কিছুই করতে পারে না। নিজের মনকে শক্ত করে, সতীশের সঙ্গে সে আর দেখা করবে না। সতীশ বিবাহিত, তাকে ভালবাসা শোভনও নয়, আর সঙ্গতও নয়।

যখন আবার দেখা হয় ইসারায় সতীশ জানায়, সময়-মত দেখা করবে। সব কথা ভুলে গিয়ে ঘাড় নেড়ে সায়

দেয়, হাঁ, দেখা করবে। চিন্তার জাল পাকাতে থাকে মাথার মধ্যে, আবার এ কি সমস্যা তার জীবনে দেখা দিল! ছোড়দাকে সে ভালবাসে। কিন্তু সে এ রকম তো নয়। আর সতীশই বা কেন ভালবাসে তাকে! তার বউ আছে, ছেলে-মেয়ে আছে। আজ সতীশের সঙ্গে দেখা হ'লে জিজ্ঞাসা করবে। দেখা হ'ল সময়মত।

শান্তি মুখের চুলগুলো সরিয়ে, পায়ের কাপড়টা টেনে দিয়ে ব'সে বললে, আচ্ছা, আপনি আমায় ভালবাসেন কেন?

এর উত্তর আমি নিজেই জানি না, কেন তোমায় ভাল-বাসি। পথ চলতে চলতে হঠাৎ ফুলের গন্ধ নাকে এলে যেমন তাকে পেতে ইচ্ছে হয়, গোড়ায় জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা ক'রে, হয়তো সেই রকম হবে। আমি তোমাকে হারাতে পারব না, তোমায় নিয়ে কোন কামনা নেই, কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই, তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবার লোভও আমার নেই। তুমি পরের হয়ে যাবে, কোথায় চ'লে যাবে দূর দেশান্তরে, আমি ভাবতে পারি না। আমি তোমায় জীবনে সাথী হিসাবে পেতে চাই। আমি চাই আর পাঁচজনের মত তুমিও মাথা উঁচু ক'রে থাকবে। তাদের চেয়ে তুমি কোন অংশে কম নয়।

শান্তি চুপ ক'রে রইল।

আজ তুমি বাড়ি যাও।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে শান্তি ফিরে এল, যেখানে শান্তির

কণামাত্র দেখা যায় না। যাদের কাছে এতটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায় না, সহানুভূতি এতটুকু মেলে না, তারা যেন সব-কিছু হারিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছে। সে যাবে কোথায়? কে দেখাবে তাকে পথ?

বিনয় রাজলক্ষ্মীকে বললে, এভাবে শান্তির জীবনটা নষ্ট ক'রো না। পাত্র দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দাও।

দোব, দোব, তাই দোব বিমলের সঙ্গে। কেন? সে কি খারাপ ছেলে?

ওরাই তো তোমার মেয়েকে গলা টিপে মেরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। মা-হারা মেয়েটাকে আবার সেইখানেই পাঠাচ্ছ?—বিনয় বললে।

রাজলক্ষ্মী বললে, যা ভাল বুঝব তাই করব। তোমার মত নিয়ে কি আমায় চলতে হবে?

যা ভাল বোঝ কর।—বিনয় বললে।

প্রত্যেক দিনের মত আজও দেখা হ'ল, কোন ব্যতিক্রম হ'ল না। সতীশ বললে, সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে, মানুষের মত বাঁচতে হবে, তার জন্যে যতই ঝড়-ঝাপটা আসুক, মাথা পেতে সহ্য করতে হবে। তোমায় আমি বিয়ে করব।

শান্তি একবার সতীশের মুখটা দেখলে।

ভুল বুঝো না, উদ্দেশ্য আমার খারাপ নয়। বাংলা দেশ, তুমি অবিবাহিতা মেয়ে, আমি একজন পুরুষ, পাঁচজনের বাড়িতে ঘর নিয়ে থাকতে হবে, দেখাশোনা করতে হবে আমাকে, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে, শুনতে খারাপ লাগবে। আর আমি যদি বলি—আমার স্ত্রী, তা হ'লে সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তারপর যা হয় একটা কাজকর্ম্ম করলে সুখে দিন কেটে যাবে।

শান্তি ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়, তা হয় না। আপনাকে আশা করা উচিত নয়, কি করব? এই ভাবেই আমাকে দিন কাটাতে হবে।

শান্তি চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে এল, কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় আর। তাই সেদিনের কথা শুনে ভগবান মনে মনে হেসেছিলেন। অন্য কোন পুরুষকে সে স্বামীরূপে মেনে নিতে পারবে না, ভালবাসা দামী পোষাকী জামা কাপড় নয় যে, যখন খুশি বদলাতে পারব। ভালবাসা অন্ধ, স্থান কাল পাত্র হিসাব করে না। তাই কবি লিখে গেছেন—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে। কিছুতেই পারবে না বিমলকে স্বামীরূপে মেনে নিতে, প্রতিবাদ ক'রে বলে, সে বিয়ে করবে না। ছুঁচের কাজ ক'রে, ছেলে পড়িয়ে, গান গেয়ে, রোগীর সেবা ক'রে দিন কাটাবে।

রাজলক্ষ্মী কোন কথায় সায় দেয় না, তার মন অটল।

শান্তির মনে পড়ে সতীশের কথা, মিথ্যে লোকলজ্জার ভয়ে পেছিয়ে পড়া উচিত নয়। মনকে সে স্থির ক'রে নেয়, সতীশের সাহায্যে সে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

কুশী কাঁচা ঘুঁটি পাকিয়ে দেয়। শান্তির কাছে গিয়ে বললে, মা সব ঠিক করেছে, সামনের রবিবারে সকালে তোমায় নিয়ে যাবে সুন্দরী বামনী। তার ছেলে বিমলের সঙ্গে তুমি থাকবে। মার কাছে শুনলাম। তুমি এভাবে জীবনটা নষ্ট ক'রো না, যা হয় একটা বিহিত কর।

শান্তি মুখ ফিরিয়ে কুশীকে বললে, তুই এত ভাবছিস কেন? কি এমন করেছে? দুধের বাটীতে বিষ মিশিয়ে স্নেহভরে মুখে তুলে ধরে নি তো? রক্ত তোলেন নি তো গায়ে জোঁক বসিয়ে? বাপ-মা-হারা মেয়ের জীবনের দাম কি আছে? খেয়ে প'রে হেসে খেলে বেঁচে আছি—এই-টেই যথেষ্ট নয় কি? একখানি ভাঁজ-করা কাগজের টুক্‌রো দিলে কুশীর হাতে সতীশবাবুকে দিতে।

তোমার কথায় সায় দিতে পারব না আমি।—ব'লে কাগজখানা নিয়ে চ'লে গেল কুশী।

এভাবে আর জীবনটা টানতে পারে না শান্তি, বেঁচে থাকতে হ'লে একটা কিছু করতে হবে তাকে। তরঙ্গায়িত দেহ তার। অচ্ছেদ্য ভাবে রূপ রস টলটল করছে তার দেহের মধ্যে। ফুটে ওঠে ফুল পাপড়ি মেলে। ছড়িয়ে পড়ে তার গন্ধ চারিদিকে। ছুটে আসে ভোমরার দল গুনগুন ক'রে। সমুদ্রের তরঙ্গ উথলে পড়ছে। সে যেন দেবতার ভোগের নৈবেদ্য। সুঠাম সৌন্দর্য্য নিয়ে নিজেকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে? পাহাড়ের গুহায়, না, সমুদ্রের অতল তলে? জনহীন গভীর অরণ্যে, না, মেঘের অন্তরালে?

আমারে পাছে সহজে বোঝ, তাই তো এত লীলার ছল,
উপরে যাহার হাসির ছটা, ভিতরে তাহার চোখের জল।

কুন্তীর হাতে চিঠি পেয়ে নির্দ্দেশমত অপেক্ষায় রইল সতীশ। রুখু চুল উড়ে এসে পড়ে চোখে মুখে, হাতে ক'রে সরিয়ে দেয় সেগুলো, দূর থেকেই নজরে পড়ে—শান্তি আসছে।

একটু দেরী হয়ে গেল, মনে কিছু করবেন না। অনেক ছল-চাতুরী ক'রে ঘর থেকে বের হতে হয়। বিশেষ ক'রে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে আমাকে। একখানি চিঠি বের ক'রে দেয় শান্তি।

চিঠি আবার কিসের ?—সতীশ বললে।

শান্তি একটু চাপা হাসি হেসে বললে, সে রকম উপকার করবার লোক আমার নেই। পরে সন্ধান পাব কি না জানি না।

তবে কার চিঠি ?—খুলে পড়তে যায় সতীশ।

বাধা দেয় শান্তি, বলে, বাড়ি গিয়ে পড়বেন, সে কথা মুখে বলা যায় না। আমার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, চিঠিতে সব বুঝতে পারবেন। আমার জন্য আপনাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে। কিন্তু—

নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক পরে শান্তি বাড়ি ঢুকল, পা টিপে ঘরে ঢোকে মায়ের বকুনির ভয়ে। ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে জানলার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ে থাকে মুক্ত আকাশের দিকে। তারা খ'সে পড়ে চোখের সামনে। কুকুরের চিৎকার কানে লাগে নিঝুম রাতে। দু-একটা রিকৃশ-গাড়ীর ঘণ্টার ঠকঠকানি শব্দ কানে আসে। সে চায় না ভোগ-বিলাসের আড়ম্বর সতীশের কাছ থেকে।

সুন্দরী বামনী ছুটে এল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা ক'রে দিনক্ষণ ঠিক করতে—পাকা ঘুঁটি কেঁচে যাবার ভয়ে।

এখন ভালয় ভালয় ডাঙায় তুলতে পারলে হয়। গাল ভারি ক'রে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বললেন, কই গো? দিদি কই গো?

পা-টা ধুয়ে এস দিদি, ঐ কি লেগে রয়েছে, পথে ঘাটে চলতে গেলে কত কি পায়ের তলে পড়ে কে বলতে পারে। কত জীব হত্যা ক'রে রক্ত নিয়ে এলে পায়ে ক'রে তার ঠিক কি! কুশী, একটু গঙ্গাজলের ছিটে দিস তো দোর-টাতে।—রাজলক্ষ্মীর গলার স্বর ক্ষীণ, আজ তার শরীরের চেয়ে মনের অবস্থাই বেশী খারাপ।

কুশীর কাছে খবর পেয়ে ছুটে এলুম। ঘরের বউ দিন-ক্ষণ দেখে নিয়ে যেতে হবে তো? ঐগুলো এখনও খুব মেনে চলি দিদি। এখনই তো নিতাই ঠাকুরের মত নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। হয়তো ঠাকুর বললেন, পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। এক-পা বাড়াই না দিদি পশ্চিমে, ওদিকের দরজাটা পর্য্যন্ত খুলি না তিন দিন, ভুল ক'রে চৌকাঠ পার হই ব'লে। কিসে কি হয় দিদি, কে বলতে পারে? কই লো, কুশী, কোথা গেলি? একটা পান দে তো বাছা।

রাজলক্ষ্মী বললেন, মাটিতে প'ড়েই মাকে খেয়েছে। বাবা ম'রে গেল, কি জলে ডুবল, কি বিবাগী হ'ল তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না আজ পর্য্যন্ত। যজমানের বোঝা তো আর চিরকাল কাঁধে ক'রে ঘোরা যায় না! শালগ্রাম শিলা হ'লে গঙ্গার জলে না হয় বটগাছের তলায় ফেলে দিয়ে

আসতাম, এ যে তা হবার নয় দিদি। ঐ কথাই রইল, রবিবার সকাল নটার মধ্যে বিমলকে সঙ্গে ক'রে আসবে। শান্তিকে নিয়ে যাবে। তোমার বোয়ের সাধ মিটবে আর আমারও বোঝা নেবে যাবে। ওঁর শরীর খারাপ, ছেলেদের চাকরি গেছে।

ও-কথা আর ব'লো না দিদি, চাকরি তালপাতার ছাউনি।—সুন্দরী বললেন।

নির্ম্মলের সম্বন্ধ ভেঙে দিলুম। এখন বিয়ে ক'রে খাওয়াবে কি? এটাকে পার করতে পারলে অনেকটা হালকা বোধ করব।

রবিবারের সকালে সুন্দরী বিমলকে সঙ্গে ক'রে নটার বদলে ছটায় এসেছে, কি জানি যদি কিছু গোলমাল হয়, মিটমাট করতে সময় তো লাগবে! সদরে ঢুকে বললেন, কই গো, দিদি কই গো?

রাজলক্ষ্মী বসতে দিলেন আসন দিয়ে। কুশীকে বললেন, দেখে আয় তো শান্তি কি করছে?

সুন্দরী বললে, থাক্ থাক্, এখন ডেকে হুড়োহুড়ি বাড়িয়ে কাজ নেই, সময়মত ডাকলেই হবে।

বিমল ভাঁজ-করা কোঁচানো কাপড় ঝেড়ে বললে, আর কত দেরি আছে মা?

রাজলক্ষ্মী হেঁকে বললেন, কুশী, শান্তিকে ডেকে দে তো, বেলা হয়েছে।

কুশী ডেকে ডেকে সাড়া পায় না শান্তির, দরজা ঠেলে ঘরে ঢোকে, চাদর টেনে দেখে—শান্তি নেই। একটা লম্বা বালিশ চাদর ঢাকা রয়েছে। চমকে উঠল কুশী। অনেক গোপন কথাই তো সে জানে, কিন্তু এ কথা তো শান্তি বলে নি তাকে!

রাজলক্ষ্মী, সুন্দরী বামনীর কানে যেতে ব্যাপারটা বেশী দেরি হ'ল না। ফুলে ফেঁপে লাল হয়ে উঠল সুন্দরীর মুখ, ভাষার বাঁধন খুলে গেল মুখ থেকে। পাড়ার লোক জড়ো করলেন হাঁকডাক ক'রে। ভট্টাচার্য্য-বাড়ির কুলুজি গাইতে লাগলেন পাঁচালীর ছড়ার মত। রসে ভেজা রসগোল্লার মত মিষ্টি তার কথা। কবিয়ালের কবিতার মত তার পদ্য রচনা। যে মেয়ের পরিচয়ের ঠিক নেই, তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে সুন্দরী বামনী! একটা অজাতের মেয়ের হাতে জল খায় বামুন—পুরুতে? কি ঘেন্নার কথা! যাক, বাঁচা গেল।

বিনয় অনেক অনুরোধ করলে চুপ করতে।

সুন্দরী জোর গলায় বললেন, তোমরা করতে পার আর আমরা বলতে পারি না? কোথায় সরালে তাকে রাতা-রাতি তাই বল না? তাই যদি মনে ছিল, তবে দরকার কি ছিল আমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে?

বিনয় বললে, এ আপনি কি বলছেন? ও-রকম ভাবে কথা বলবেন না।

মারবে না কি? জোয়ান হয়েছ, গায়ে বলও আছে। ছেলে থাকলে মেয়ের অভাব! বেল পাকলে কাকের কি? চোখের ভাষায় গাল দিয়ে, বিমলের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শান্তি সতীশকে বললে, ঘর ছেড়ে এখন রাস্তায় এসেছি, থাকবার একটা ব্যবস্থা করুন।

সতীশ এক বন্ধুর সাহায্যে একটা বাড়ির দোতলায় একখানি ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করলে, নতুন যোগাড় ক'রে দিলে রেঁধে খাবার জিনিসপত্র। সতীশ এ-কথা ও-কথা ব'লে সমস্যা বাধায় আর শান্তি সমাধান করে। পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজল।

শান্তি পেরেকের ঘা বন্ধ ক'রে লক্ষ্মী প্রতিমার ছবিখানা ঝুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে, বাড়ি যাও, রাত হয়েছে।

কি ক'রে যাই বল? একটি মেয়ে একা একটা ঘরে রাত্রিবাস করবে, তার স্বামী থাকবে না সঙ্গে, আবার সকালে দেখতে পাবে—কি জবাব দেবে বল তো লোকের কাছে?

তা ব'লে তো নিজের সংসার ফেলে এখানে থাকা হয় না। দিদি খোকা খুকু মনে করবে কি? আর জবাব একটা যা হোক দিয়ে ঠিক চালিয়ে নেব। জানলার পরদার দড়িটা টান ক'রে বাঁধে শান্তি।

কাল সকাল সাতটার মধ্যে আসব। দরজা বন্ধ ক'রে সাবধান হয়ে থাকবে।—ব'লে চ'লে গেল সতীশ।

দিন কতক পরে বউবাজারের ধার দিয়ে আসছে শান্তি আর সতীশ। অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে গেল বিমলের সঙ্গে।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা জোর ক'রে মাটিতে ফেলে, মিঠে সুরে বিমল বললে, এই যে, থাকা হয় কোথা গা-ঢাকা দিয়ে?

কাকে কি বলছেন?—সতীশ বললে।

হ্যাঁ, ঠিক বলছি, ওকে দিয়ে জড়োয়ার গয়না চুরি ক'রে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ানো হচ্ছে? থানায় যেতে হবে আপনাদের।

শান্তি সতীশের মুখের দিকে চাইল, কোন কথা বললে না।

যাচ্ছি, তার আর কি আছে! কথার মধ্যে কোন জড়তা বা ভয় কিছুই ছিল না। চেন না কি?—শান্তিকে বললে।

বিমল, ভট্টাচার্য্য মশায়ের মেজ জামাই, প্রমিলাদির বর।

বিমল থানায় ইন্সপেক্টরকে বললে, আমার স্ত্রী, সোনার আর জড়োয়ার গয়না চুরি ক'রে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়েছে।

প্রতিবাদ করে শাস্তি।

ইন্সপেক্টর শাস্তিকে বললেন, সতীশ তোমায় ফুসলে নিয়ে এসেছে—তুমি অন্যের স্ত্রী ?

মিথ্যে কথা। আমি কারও স্ত্রী নয়, আর আমি কচি খুকি নই বা একটা কাপড়ের পুটুলি নই যে, উনি আমায় তুলে নিয়ে আসবেন। আমি নিজে ইচ্ছা ক'রে এসেছি, ওঁকে আমি বিয়ে করেছি।

ইন্সপেক্টর সাহেব রেগে পোড়া সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জোর ক'রে মাড়িয়ে বললেন, তবে প'চে মর গারদখানায়। হন হন ক'রে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সতীশের ওপরও কথার প্যাঁচ কম পড়ে না। প্যাঁচ কাটিয়েছে সে জোরদার কথা ব'লে।

অনেক ভয় দেখায় বাড়ির লোকেরা. জেল হবে—বাড়ি ফিরে যেতে পরামর্শ দেয়। শান্তি অচল, অটল—কোন কথায় সায় দেয় না।

এই লেখাটাতে একটা সই ক'রে দাও তো।—ব'লে একটা লেখা কাগজ এগিয়ে দেয় বিমল, শান্তি প'ড়ে দেখে, তাতে লেখা আছে—আমি বিমলের স্ত্রী, আমাকে ভুলিয়ে

গয়না শুদ্ধু ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে এসেছে, সতীশ আমার কেউ নয়।

শান্তি কাগজখানা ফেলে দেয়, সই সে করবে না।

সতীশের বাবা তাঁর বন্ধু রমেশকে দিয়ে জামিনে খালাস ক'রে আনলে তখনকার মত। কেসের দিন বড় বড় উকিলরা বিমলকে বললে, মেয়ে সাবালিকা, আপনার বউ প্রমাণ করতে না পারলে, মানহানির দায়ে জড়িয়ে পড়বেন। এ নিয়ে আর গোলযোগ করবেন না। শান্তির কথাতে আর বিমলের প্রমাণের অভাবে কেস ডিসমিস হয়ে গেল।

ভট্টাচার্য্যের সংসারে অশান্তির ঝড় উঠেছে, যেমনই তার রঙ তেমনি তার বেগ। এ সংসারের শান্তি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে শান্তি। ফেলে গেছে অশান্তির তাণ্ডব নৃত্য। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স'রে গেছে কাঞ্চন তার ক্ষুদ্র সংসার নিয়ে। মা বাবাকে দিয়ে গেছে ছোট ভাই বিনয়ের ওপর। পাতাঝরা ফুলের মত ঝ'রে গেল ভট্টাচার্য্যের সংসার। বিনয় পিতা-মাতার অন্নের সংস্থান করতে অক্ষম। সামান্য খবরের কাগজ বিক্রি ক'রে যে পয়সা উপার্জ্জন হয় তাতে পারে না সংসারের অনটন দূর করতে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, বিনয়, একটা উপায় কর্ বাবা ; এভাবে আর চলে না, কর্ত্তার মুখের দিকে তাকানো যায় না।

কি করব বল ?

রাজলক্ষ্মী বললেন, তোর বড়দাকে ডাক্, নির্ম্মল তো একরকম সংসার ছাড়া হয়ে গেছে। তোর মুখের দিকে চাওয়া যায় না। রমিলা পারুলকেও ডেকে পাঠা, সকলে ব'সে একটা যুক্তি কর্। তা না হ'লে আর উপায় কি বল্ ?

বিনয় মায়ের কথামত রমিলা পারুলকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠালে, কাঞ্চনকে খবর দিলে নিজে গিয়ে।

সময়মত দেখাও হ'ল সকলের সঙ্গে।

কাঞ্চন ভট্টাচার্য্য মশাইকে জিজ্ঞাসা করলে, আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ? গলার স্বর যেমনি অস্বাভাবিক তেমনি কঠিন।

ভয়ে ভয়ে ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন, আমি জানি না তো, তোমার মা ডেকে-ডুকে কি সব করছেন, আমার কথা কানে নেয় না আজও।

মা, তুমি ডেকে পাঠিয়েছ ?—গলার স্বর নীরস, চঞ্চলতা অস্বাভাবিক।

রাজলক্ষ্মী বললেন, এলি, ব'স্। খোকাখুকু কেমন আছে ?

তাদের খবর নেবার জন্যে তো ডাক নি। সব ভাল আছে। কি বলছ তাই বল ? রমিলা পারুলকে দেখে বললে, সব যে এসে পড়েছ, ব্যাপার কি বল তো বিনয় ? ঘরের মধ্যে চলাফেরা করে কাঞ্চন।

কাঞ্চনের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন রাজলক্ষ্মী, বুঝতে পারেন না তার ভাবগতিক।

বিনয় বললে, দিদিকে পারুলকে মা ডেকেছেন, আমাদের সংসারের একটা হিত করবার জন্যে।

মানে ?—কাঞ্চন বললে।

রমিলা বললে, এটা আর বুঝতে পারছ না দাদা ? বিনয় সংসার চালাতে অক্ষম, মা-বাবার দু বেলা খাওয়া জোটে না, রোগে ওষুধ পড়ে না পেটে। আমাদের একটু দেখা দরকার তো মা-বাবাকে।

কাঞ্চন বললে, তোমরা এখন কি বলছ তাই বল ! আমি একজনার আমার অংশমত ভার নিতে রাজী আছি।

কি রকম ?—বিনয় বললে।

এই ধর মাসে দশ দিন বাবা আমার ওখানে থাকবেন।—কাঞ্চন বললে।

রমিলা বললে, আর বাকী দিনগুলো ?

কাঞ্চন বললে, বাকী দিনগুলো নির্ম্মল, বিনয় দশ দিন ক'রে চালাবে। আর মা মেয়েদের ভাগে পড়াই ভাল।

তুমি কি বলছ দাদা ?—বিনয় বললে।

আমি ঠিক বলছি, মা মেয়েদের ভাগে পড়াই উচিত, যত্ন পাবেন।

বিনয় বললে, মেজদা তো এক রকম বাড়ি-ছাড়া, তার ভাগটা তো তোমায় আমায় নিতে হবে ?

কাঞ্চন বললে, নির্ম্মল মা-বাপকে ফেলতে পেরেছে ব'লে তো আর আমি ফেলতে পারব না। পনের দিন আমার ওখানে বাবাকে পাঠিয়ে দিও।

পারুল বললে, তুমি বাবার পনের দিনের খরচা দাও না দাদা, বাবা এখানেই থাকবেন, মা বাবা বর্ত্তমান থাকতে স্থানান্তরিত হয়ে থাকবেন কেন?

রাজলক্ষ্মী বললেন, পারুল, থাম না, বড়দাদার মুখের ওপর কথা বলতে শিখেছ! চোখের জল মুছলেন কাপড়ের খুঁট দিয়ে।

কাঞ্চন বললে, আমায় সব দিক বাঁচিয়ে চলতে হবে তো? নতুন কারবার করেছি, তাতে লস যাচ্ছে, অঞ্জলির স্কুলের মাইনে, বাড়ির মাষ্টারের মাইনে, গানের মাষ্টারকে কম ক'রে পঁচিশ টাকা দিতে হয়। সেলাইয়ের কাজের মেজদিদির হাতখরচ দিতে হয় পনের টাকা, পঁচাশি নব্বই টাকা তো ওর পিছনেই যায়। ও থেকে তো আর কম করা যায় না। বড় শালাটা দেড় মাস দিদির বাড়ি প'ড়ে আছে, তাকে তো আর তাড়িয়ে দিয়ে মান খোয়াতে পারি না?

রমিলা বললে, বেশ, তুমি বড় থেকে যখন ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছ আমরা মায়ের ভার নেব। আমার ওখানে মা পনের দিন মাসে থাকবেন।

পারুল বললে, মায়ের খোরপোষ ভাগ ক'রে নিচ্ছ দিদি? তোমার অভাব কি দিদি? তুমি তো মাকে স্থান দিতে পার,

যে কদিন বাঁচবেন। জামাই বাবুর ব্যবসা, বাড়ি ভাড়া, তার পর সুদি কারবারও আছে শুনেছি।

রমিলা বললে, তোরা আয়টাই শুনতে পাস, ব্যয় কত তার খবর রাখিস? সুট কাচাতে আর ট্যাক্সি ভাড়া দিতে দিতে সব শেষ হয়ে যায়। লোকজনের কাছে মান রাখতে খরচা কত হয়! তার পর সংসার-খরচ—আজকালকার দিনে সহজ কথা নয়।

পারুল বললে, বেশ, মা পনের দিন তোমার ওখানে, পনের দিন আমার ওখানে থাকবেন। আমার উনি ওকালতি করেন, দিন চলে না তাতে। বাড়ি ভাড়া আর ওকালতির ঠাট বজায় রাখা দায় হয়েছে। তবুও মায়ের সেবার ত্রুটি হবে না আমার কাছে।

রাজলক্ষ্মী নিশ্চল পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছেন। কথা বলতে পারেন না। উঠতে গেলে সারা দেহটা কাঁপে, পারে না পা দুখানা টানতে দেহটাকে। ঝিমিয়ে আসে গলার স্বর। কর্ত্তাকে ছেড়ে থাকতে তাঁর মন সরে না, আজ সাত-চল্লিশ বছরের মধ্যে একদিনও ছাড়াছাড়ি হয় নি। মনে পড়ে সাত বছর বয়সে গৌরীদানের কথা।

ভট্টাচার্য্য মশাই শুয়ে শুয়ে বললেন, নিরুপায়—আমি নিরুপায়। শান্তি আমায় ছেড়ে গেছে। লক্ষ্মীছাড়া হলুম শেষে। এটা হবে ব'লে আমার জানা ছিল। ধর্ম্মের সংসারে অধর্ম্ম স্থান পায় না, অধর্ম্মের সংসারে লক্ষ্মী থাকবেন কেন?

কাঞ্চন নিয়ে গেল বাপকে সঙ্গে ক'রে, মাকে নিয়ে গেল রমিলা। চোখ ফেটে জল পড়ল রাজলক্ষ্মীর। ভট্টাচার্য্য চেপে রাখেন বুকের ব্যথা, চোখের জল। মিলনের বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন হয়ে গেল কালের প্রভাবে। ভরা গাঙে জল ওঠে দুকূল ছাপিয়ে।

শান্তি দরজিপাড়ায় নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বাড়িতে কাজ ধরেছে। কাজ এমন কিছু নয়। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী বিলেত গেছেন। বৃদ্ধা মা আর একটি মেয়ের দেখাশোনার ভার শান্তির ওপর। খাওয়া আর পঞ্চাশ টাকা নগদ। দু বেলা সময়মত হাজির দিতে হয়।

নরেন্দ্রনাথ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ঝি চাকরদের কাছ থেকে চাবুক মেরে কাজ আদায় করতে হবে তোমাকে। এ বাড়ির সব ভার তোমার। মায়ের কথায় কান দিও না। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, চায়ে চিনি দিতে ভুলে গেছ না কি? মনটা থাকে কোথা? মুখার্জ্জি তোমার কে হয়?

শান্তি বিরক্ত হয়ে বললে, জানেন তো তিনি আমার স্বামী।

এ আবার কি রকম স্বামী? তার তো ঘর সংসার, ছেলে বউ আছে!

শান্তি গোপনে খবর নেয় পুরনো দাস দাসীর কাছ থেকে। তারা বলে, কত মেয়ে এল, কত গেল—বাবুর এটা চোখের নেশা। অবিবাহিত মেয়েরা স্থান পায় না এ বাড়িতে। এ ত একটা বাবুর চাতুরী।

সতীশকে সব কথা বলে, গোপন করে না কিছুই। অভাব-অভিযোগের দুর্ব্বিপাকে প'ড়ে বাধ্য হয়ে চাকরি বজায় রেখেছে। অনেক শক্ত হয়ে ইজ্জত বজায় রেখে চলেছে।

নরেন্দ্রনাথ গোপনে একে একে সব খবর সংগ্রহ করেছেন। সুযোগ বুঝে ভদ্র সমাজের খোলস ছেড়ে বললেন, ও তোমার কি রকম স্বামী, ওর যা অধিকার আছে আমারও তাই আছে। তোমায় আমার চাই।—কথায় কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই। পঞ্চাশ কেন—পাঁচশো টাকা পাবে। মুখার্জ্জিকে মাসে একশো ক'রে দেব। দরকার হ'লে দশ পনের হাজার টাকা দিতে পারি, দরকার হ'লে গুলি ক'রে সরিয়ে দিতে পারি। একরাশ ছবি আর কতকগুলো চিঠি ছড়িয়ে দিলেন নরেন্দ্রনাথ।

শান্তি বললে, তাই যদি হয়, তবে আপনি এই বাজে কাজের জন্য লোক চেয়েছেন কেন? স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব হরণ করবার জন্যে? পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেন নি কেন?

ঐ তো, পাত্রী চাই লিখলে, কাঁচা মেয়ে এসে জুটবে,

সারা জীবন তাই নিয়ে খুশি হতে হবে। আর এ না হ'লে তোমাদের মত সিঁথেয় সিঁদুর রঙ-চঙে মেয়ে পাব কি ক'রে ? বিয়ে করব বললে তো আর তোমার মুখার্জ্জি মালা হাতে পাঠিয়ে দিত না দাশগুপ্তর গলায় দেবার জন্যে।

সেদিন কাজ ফেলে চ'লে আসে। মন স্থির করলে, না খেতে পেলেও এ কাজ করবে না। দু দিন কেটে গেল, পর-দিনে একটা হিন্দুস্থানী চাকরের হাতে এক টুকরো কাগজে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—একবার দেখা করবার জন্যে। মনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে দেখা করে শান্তি।

যেমনি মিষ্টি কথা, তেমনি সরল হাসি, হাতের বইখানা নাড়াচড়া ক'রে দাশগুপ্ত বললেন, তুমি আসবে জানতুম। সেদিনের কথা ভুলে যাও, কালকের দুপুরটা থাকতে পারবে না ? তোমার শরীরটা সারবার জন্যে ইনজেকশন নেওয়া দরকার।

এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর শান্তি সায় দিলে, ডাক্তার বলেছেন, হয়ে ওঠে নি।

সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে চাপা গলায় বললেন, আমার কাছে নিতে আপত্তি আছে ? হাতে ক'রে একটা টেন সি. সি. ফাইল দেখালে। বেদনা হবে না। বিশ্বাস না হয়, অন্য ডাক্তারকে দেখিয়ে নিয়ে এস।

শান্তি একটা ফাইল হাতে ক'রে নিয়ে এল, সতীশকে সব কথা বললে।

সতীশ তার বন্ধুর হাত দিয়ে অন্য ডাক্তারের কাছে পাঠালে, ফলাফল জানবার জন্যে। ইন্‌জেকশনের ফাইলটা হাতে নিয়ে পরিচিত ডাক্তারকে দেখালে।

ডাক্তার ঘোষ হাতে ক'রে নেড়ে চেড়ে বললেন, হয়েছে কি? মাথা ঝিমঝিম করে? বুক ধড়ফড় করে? দুর্ব্বল শরীর? তা এ কোম্পানীর দেবেন কেন? দশ সি. সি. এক সঙ্গে দিলে আর এক পাও চলতে পারবে না, সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বে। আর একশো চার পাঁচ জ্বর সঙ্গে সঙ্গে হবে। পাঁচ সি. সি. দিন না, তাও একদিন অন্তর।

সব কথা শুনলে সতীশ আর শান্তি, দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝতে বাকি রইল না। ফাইলটা হাতে ক'রে নিয়ে গিয়ে ফিরে দেয় দাশগুপ্তকে।

দাশগুপ্ত কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, মত হয়েছে? মুখার্জ্জি কি বললে?

কোন উত্তর এল না ওদিক থেকে।

বিয়ে আমি তোমায় করবই। কি জন্য তুমি সতীশের কাছে প'ড়ে আছ? তুমি কি বুঝতে পারছ না, সে কোন দিন তোমায় খেতে দিতে পারবে না। তোমায় সারা জীবন খেটে খেতে হবে, রাস্তায় ম'রে প'ড়ে থাকবে। আর একটা বউ আছে, তাকে চাকরি করতে পাঠাক তো দেখি? তোমার হয়ে প্রতিবাদ করবার কেউ নেই ব'লে? কি দিয়েছে তোমায়? রাস্তার ভিখারীর অধম ক'রে রেখেছে।

শান্তি সায় দেয় না কোন কথার, সলজ্জভাবে ব'সে থাকে মাটির দিকে চেয়ে।

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার সুরু করলেন দাশগুপ্ত, বেশ তো, তোমার যদি বিয়ে করতে আপত্তি থাকে বিয়ে না ক'রেও তো থাকা যায়। তাতে তোমার স্বামী এতটুকুও টের পাবে না। যতদিন না বিয়ে করতে পার, এইভাবে চলুক। বিয়ের পর সম্পত্তি, টাকাকড়ি যা আছে সমস্ত তোমার নামে লিখে দেব। সৌখিন ভাবে দিন কাটাতে পারবে। মেম সাহেবরা কিন্তু এসব গ্রাহ্যই করে না।

শান্তি ঘৃণা-লজ্জা ত্যাগ ক'রে, জড়তা কাটিয়ে, মাথা তুলে বললে, আমায় যদি তাদের একজন মনে করেন তা হ'লে মস্ত ভুল করবেন। আজ আমি এইটুকু আপনাকে জানিয়ে গেলাম, পৃথিবীতে এমন মেয়ে আছে যাকে টাকায় বশ করা যায় না।

হেসে উড়িয়ে দেয় নরেন্দ্রনাথ। অপমান সে অনেক সহ্য করেছে, তবে রিক্ত হস্তে ফেরে নি কোন দিন।

দাশগুপ্তের মা সুযোগ বুঝে কাছে এসে বললেন, অনেক মেয়ে এসেছিল ওর কাউকে মনে ধরে নি, তুমি বাছা এইখানে থাক না।

আপনি মা হয়ে এ কথা বলছেন?

কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে এল শান্তি।

সতীশ বললে, তোমায় বলেছিলাম, ও-কাজ নিও না। আমার যা হবে তাই খাবে, শুনলে না তো আমার কথা।

শান্তি বললে, আমি চাই আমার জন্যে তোমার বা দিদিদের ক্ষতি না হয়। দু টাকা বাঁচাতে পারলে সেই দু টাকা ওখানে দিতে পারবে। ইচ্ছে আছে টাইপের কাজটা শিখে রাখব, চাকরির পক্ষে সুবিধা হবে।

সতীশ বললে, দেখ। পার ভাল, আমার যা আছে বাড়িঘর সে এখন আমার নয়, বাবা বর্ত্তমান, মা আছেন, স্ত্রী ছেলে মেয়ে—কাজেই সে থাকা তো না-থাকা।

শান্তি বললে, সে দেখে আমি তোমায় বিবাহ করি নি। আমাকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

দিন যায় স্রোতের জলের মত, পারে না বাধা দিতে তার গতি।

চাকরি করে তিন দফা। ঘোষেদের মেয়েকে পড়ায়, অফিস করে দশটা পাঁচটা, করুণাকে উলের কাজ শেখাতে যেতে হয় সন্ধ্যে সাতটায়, শেষ ট্রামবাস ধ'রে ফিরতে হয়, তারই ফাঁকে ডাক্তারি শিখতে হয় শান্তিকে।

নীচের ভাড়াটেরা শান্তিকে নিয়ে কানাঘুষো করে, এ আবার কি রকম চাকরি? সাতটায় যাচ্ছে আটটায় আসছে, নটায় যাচ্ছে ছটায় আসছে, রাত এগারটা পর্য্যন্ত? গিন্নীর বড় ছেলে বললে, আমি একবার জিজ্ঞেস করব।

গিন্নী বললেন, তোদের কাজ নেই কথা ব'লে, আজ এলে আমি জিজ্ঞেস করব। গেরস্থ ঘরের বউ, এ কি রকম চলাফেরা!

শান্তি রোজকার মত আজও বাড়ি ফিরেছে রাত্রি এগারটার সময়। উঠে গেল সিঁড়ির মাঝপথে।

গিন্নী পিছু ডাকলেন, বউমা! বলছিলুম কি, এত রাত্রে কোথা থেকে ফিরছ? সারাদিন ঘরের বাইরে। তোমায় কেউ কিছু বললে, আমার গায়ে বাজে যে মা।

শান্তি সিঁড়ির মাঝপথে ফিরে দাঁড়িয়ে শুনলে, নেবে এল চকিতের ন্যায়, বাধা মানল না গলার স্বর, জোর গলায় বললে, আমার যে অনেক কাজ মা, আমায় যে বিলেত যেতে হবে ডাক্তারী শিখতে, বাবার যে আদেশ। অনেক টাকার দরকার। বাবা-মা বিলেত গিয়েছিলেন, আর আমি যাব না? মায়ের হাত দুটো ধ'রে সজোরে ঝাঁকানি দিলে শান্তি। চোখে জল ভ'রে উঠল দু কূল ছাপিয়ে, লুটিয়ে পড়ল মায়ের কাঁধে মাথাটা।

বৌ-ঝি সকলে শুনলে, করে কি রাত এগারটা পর্য্যন্ত রাস্তায়। দূর হয়ে গেল তাদের মনের ময়লা। সন্দেহ ঘুচে গেল মন থেকে।

কয়েক বৎসর কেটে গেল, অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে ভট্টাচার্য্য-সংসারের ওপর দিয়ে। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই আজ অনেক দিন, ইচ্ছে হয় চোখে দেখবার, অন্তরের ভালবাসা চেপে রাখা যায় না, ফুটে ওঠে ছাই-চাপা আগুনের মত। বিনয়কে ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন, তোর মার খবর কি? একবার দেখতে ইচ্ছে করে। আছে কেমন? পারুলের ওখানে আছে তো? আমার যেন কি হয়েছে, সব কথা মনে থাকে না। শান্তির কোন খবর রাখিস? কোথায় আছে, কেমন আছে?

বিনয় বললে, কোথায় আছে জানি না, তবে ওর এক বন্ধুর হাত দিয়ে চিঠি দিয়েছে।

কি লিখেছে শান্তি?

বিনয় বললে, ব্যস্ত হবেন না, লিখেছে—ভাল আছি, বাবাকে দেখতে ইচ্ছে হয়, সময়ে দেখা হবে।

উঠে বসলেন ভট্টাচার্য্য মশাই, বললেন, লিখেছে—দেখা হবে? দেখা হবে? নিশ্চয়ই হবে। শুয়ে পড়লেন বিছানায়। মনে প'ড়ে যায় বোস সাহেবের বিশ্বাসের বাণী। এতটুকু সন্দেহ করেন নি আমাকে, দু হাতে তুলে দিয়েছেন জড়োয়ার গয়নাগুলো। নাবালিকার গচ্ছিত ধন অপহরণ করলে শান্তি মেলে না। তাই শান্তি চ'লে গেছে অশান্তি দিয়ে। না না, থাক্, কি বলতে কি বলছি! আমার মাথার ঠিক নেই। কি

যেন কি রকম জ্বালা করছে মাথার ভেতরটা। কে যেন গলা টিপে ধরছে, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। পারবি? পারবি? আমায় রক্ষা করতে? পাপের পঙ্কিল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে?

বিনয় বুকে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, কবিরাজ মশাই বলেছেন, সপ্তাখানেক ওষুধ খেলেই সেরে যাবে।

বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে চ'লে যায় কাঞ্চনের বাড়িতে।

কাঞ্চন বাড়ি ফিরে, গলার নেকটাই ধ'রে টানাটানি করছে, চোখ ছুটো ওপর দিকে, পায়ের শব্দ কানে এল।

'বড়দা'—ব'লে ঘরে ঢুকে চেয়ারটা টেনে বসল, আওয়াজও হ'ল ঘড় ঘড় ক'রে। শব্দ শুনে লীলাবতী দাঁড়াল দরজার আড়ালে। নিজেকে লুকিয়ে রাখলে বিনয়ের চোখ থেকে।

কাঞ্চন বললে, কি হয়েছে বিনয়? হঠাৎ এ সময়? গায়ের কোটটা ছুঁড়ে দিলে লীলাবতীর হাতে।

একটু সমীহ ক'রে বিনয় বললে, বড়দা, বাবার অসুখ উত্তর উত্তর বেড়েই চলেছে, কবিরাজের ওষুধে বিশেষ কিছু হচ্ছে না। একজন ভাল ডাক্তার দেখাবার ইচ্ছে করছি,

টাকার অভাবে পারছি না। তুমি কিছু টাকা দাও না বড়দা, বাবাকে ডাক্তার দেখাই আর মাকেও নিয়ে আসি পারুলের ওখান থেকে। বাবার বড় ইচ্ছে হয়েছে মাকে একবার দেখবার।

কাঞ্চন চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বসল, লীলাবতী হাত নেড়ে ইসারায় ডাকলে কাঞ্চনকে। বললে, তুমি টাকা পাবে কোথা? ব্যবসা ভাল নয়, দিন দিন লোকসান হচ্ছে, মেয়ের নাচের মাষ্টার, পড়ার মাষ্টার, বোনা সেলাইয়ের দিদিমণির মাইনে। তার ওপর সংসারের খরচা দ্বিগুণ হয়েছে। তারপর নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে ডোনার্সের খাতায় সই করিয়ে নিয়ে গেছে তার একশ টাকা দিতে হবে, তোমাকে এ কথা বলতে ভুলেই গেছি। তাছাড়া তোমার পালা তো তুমি করেছ।

কাঞ্চন সব কথা বললে বিনয়কে, আর বললে, আমি কি করতে পারি?

বিনয় উপায়ান্ত না দেখে বললে, তুমি আমায় উপস্থিত পঞ্চাশ টাকা দাও, মাকে নিয়ে আসি আর বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। আমার কাছ থেকে লিখে নাও, যাতে তোমার টাকা নষ্ট না হয়।

তোমার আছে কি? দেবে কোথা থেকে?

বিধির বিধান, একই মায়ের দুই সন্তান। রাজার কাছে হাত পাতলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এক পয়সা দিলে পুঁজি ক'মে

যাবে। ভিখারীর কাছে হাত পাতলে, পারে না ফেরাতে, তার ছেঁড়া তালি-দেওয়া থলে হাঁটকে বের ক'রে পয়সা ফেলে দেয় অনাথ ভিখারী ছেলের হাতে।

বিনয় ব'সে থাকে নির্ব্বাক হয়ে, পারে না তুলতে মাথাটা।

লীলাবতী বললে, ঠাকুরপো, একটু চা খেয়ে গেলে হ'ত?

ধাক্কা খেয়ে উঠে পড়ল বিনয় বললে, থাক্, যাচ্ছি।

বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে। বিনয়ের সেবা-যত্নে আর কবিরাজি চিকিৎসায় ভাল হ'ল বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন না ভট্টাচার্য্য মাশাই।

ঘরের মেঝের ওপর বিছানায় শান্তি শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে, গলার স্বর ক্ষীণ। মুখ দেখে বোঝা যায় শরীরের যন্ত্রণার পরিমাণ। এ-ধার ও-ধার করে বার বার। সতীশ মাথায় জলের পটি দিয়ে জ্বর নামাচ্ছে। চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে মুখ থেকে। পাতলা চাদরটায় ঢেকে দেয় দেহটাকে। বলে, আমার কথা তো শুনবে না। তিনটে কাজ, সকাল থেকে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত।

শান্তি ক্ষীণ স্বরে বললে, তুমিও বলবে ঐ কথা ?

সতীশ বললে, এই এত ঝড়-ঝাপটা সহ্য ক'রে একটু সামলেছ। তার পর কাজের ওপর কাজ। এই ওষুধটা খেয়ে নাও দেখি। ওষুধের গেলাসটা এগিয়ে ধরলে।—আর এই বেদনার রসটুকু।

শান্তি বিরক্তি হয়ে বললে, বললাম তো একটু পরে খাব।

পরে কেন, খাও না, সময় তো হয়ে গেছে।

দাও।—ব'লে হাত বাড়ালে শান্তি। চোখ বুজে ঢোক গিললে, কি তেতো !

তোমার জন্যে মিষ্টি ওষুধ কালকে ক'রে আনব।

কটা বেজেছে ? দেখ তো বুকে হাত দিয়ে, কি রকম করছে, না ?

সতীশ বললে, ও কিছু নয়। দশটা বেজেছে একটু আগে।

তুমি বাড়ি যাবে না ?—শান্তি বললে।

তোমায় এ অবস্থায় ফেলে আমি বাড়ি যাই কি ক'রে ? একটু ওষুধ দেবার, জলের গেলাসটা ধরবার লোক নেই। আজ আর বাড়ি যাব না।

শান্তি জ্বরের ঘোরে বললে, কি বললে ? যাবে না ? দিদি ছেলেমেয়ে তারা কি মনে করবে ? আমার হাতের গোড়ায় এক গেলাস জল ভ'রে রেখে যাও। আর লোক

নেই বলছ? বাড়ি-ভরতি লোক রয়েছে। সে কথায় ছিল অসংখ্য বেদনা, চোখে ছিল অফুরন্ত বারিধারা। ম্লান হাসি ফুটে উঠল, মিলিয়ে যায় তখনি মরীচিকার মত।

ও কি বলছ তুমি? এটা তোমার রাগের কথা।

না না, ও কিছু নয়, এখন মরব না। আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সব বাকি। বিলেত যাব, ডাক্তারি শিখে আসব। পারব না? তুমিও বলছ—পারব না?

সতীশ বললে, পারবে, পারবে—তুমি নিশ্চয়ই পারবে। একটু চুপ ক'রে ঘুমোও দেখি।

তুমি যাও লক্ষ্মীটি, কাল সকালে এস। দরজাটা টেনে দিয়ে যেও। দিদি আমায় ভুল ভাবতে পারেন। খোকা খুকু মনে করবে কি?

সতীশ হাতের কাছে ওষুধের শিশি আর জলের গেলাস রেখে বললে, কাল সকাল ক'রে আসব। যদি ওঠবার দরকার হয়, কাউকে একবার ডেকে নিও—উপায় কি?

বেরিয়ে গেল দরজাটা টেনে দিয়ে।

পিতার ডাইরি বইয়ের কথা মনে প'ড়ে যায়, মাথায় হাত দিয়ে ভাবে শান্তি। "খেলাঘর"—শেষ অনুশোচনায় গাঁথা বইখানা।

দিন কতক পরে। দিনের শেষে সাঁঝের প্রথমে বাতিটা জ্বেলে সতীশ বললে, সখ মিটল তো ওষুধ খাওয়ার, এবার একটু ধরা-কাটায় থেকে শরীরটা শুধরে নাও।

শান্তি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, শরীর আমার ভালই আছে, আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি এখন। ডাক্তারিটা পাস ক'রে এসে কি করব জান ?

কি করবে ? মানুষ কাটবে না কি ?

শান্তি মুখের দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁ, ঠিক তাই। একই ছুরি, কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন—গুণ্ডার ছুরি প্রাণ নেয়, আর ডাক্তারের ছুরি প্রাণ দেয়।

সতীশ বললে, কি বলব শান্তি, তোমার ইচ্ছা সফল হোক। অশান্তির জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু তোমায় ছেড়ে থাকতে আমার কোন ব্যথা নেই, তুমি বিলেত যাবে, দশজনের একজন হবে, পিতা মাতার মুখ রাখবে।

মোর লাগি করিও না শোক, আমার রয়েছে কর্ম্ম,
আমার রয়েছে বিশ্বলোক,
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ
এই ব্রত নিয়েছি সদাই।

শান্তি বিলেত গেছে ডাক্তারি শিখতে, ভাল মন্দ খবর আসে চিঠিতে। স্ত্রী-চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করছে সে। ফিরে এসে চেম্বার করবে—কত লোকের প্রাণ বাঁচাবে। এটা তার অর্থের লোলুপতা নয়, আন্তরিক ইচ্ছা। রামহরি ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা করবে যোগ্য সন্তানের অধিকার নিয়ে। রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করবে স্নেহের দাবীতে। দাদা ভাইদের চোখ খুলবে শান্তির উচ্চ আশার সফলতা লাভের কথা শুনে।

রামহরি ভট্টাচার্য্য শোকে তাপে জর্জ্জরিত হয়ে কয়েক দিন যাবৎ রোগাক্রান্ত হয়েছেন। রাজলক্ষ্মীকে রমিলার দুর্ব্ব্যবহারে বাধ্য হয়ে গাঁয়ের ছেলের হাত ধ'রে ফিরতে হয়েছে। বিনয়ের আয় ক'মে গিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। কোন রকমে দিন চলে ঠেলে ঠুলে। কাঞ্চনের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে অনেক দিন। সে এখন বাড়ির দালালি করছে বিনা পুঁজিতে। সারা বছরের জুতোর পয়সা হয় না ঘুরে ঘুরে। লীলাবতী অলঙ্কারের শোকে কথা বলে না স্বামীর সঙ্গে। নির্ম্মল এ সংসারের মায়া ত্যাগ করেছে অনেক দিন।

কখনও পার্কের ছাউনিতে, আর কখনও পুলিশের লাঠি আর জেলের ডাল ভাত খেয়ে দিন কাটাতে হয়।

ভট্টাচার্য্য মশাই এদিক ওদিক ক'রে বললেন, আমি আর বাঁচব না, আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। শান্তির কোন খবর জান? মা আমার অন্নপূর্ণা। তিন চার বছর তার কোন খবর পাই নি। কেউ খোঁজও করে না, মা-বাপ-মরা অনাথ মেয়েটা গেল কোথায়? আমার সঙ্গে দেখা হবে—সে বলেছে, মানুষ হয়ে দেখা করবে। আমার যে দিন ফুরিয়ে আসছে।

রাজলক্ষ্মী বুকে হাত বুলিয়ে দেয়, হাত দুটো টিপে দেয়। বিনয়কে বললেন, কবিরাজ মশাই কি বললেন?

কবিরাজ মশাই বললেন—এ সময় একজন ভাল ডাক্তার দেখালে ভাল হয়, আজ কাল নানান রকম ওষুধ উঠেছে, ফোঁড়া-ফুঁড়ি করলে সারতে পারে। টাকা কোথায় পাব মা, বলতে পার?

শান্তির কাছে টাকা থাকলে, দেবে না?

দেবে না মানে? আমি জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে আসতুম। তাকেই তো আমি খুঁজছি। রতনের কাছে শুনলাম, শান্তি নাকি বিলেত থেকে বড় ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে।

রাজলক্ষ্মী বললেন, বলিস কি রে খোকা? চোখ দুটো বড় হয়ে কপালে উঠে গেল।—শান্তি? আমাদের শান্তি বটে তো? আমি যে ভাবতেই পারছি না বাবা।

বিনয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রাজলক্ষ্মী রামহরি ভট্টাচার্য্যের গায়ে ঠেলা দিয়ে সজাগ ক'রে বললেন, ওগো, শুনছ, শান্তি—আমাদের শান্তি, বিলেত থেকে বড় ডাক্তার হয়ে ফিরে এসেছে, কত সব নম্বর নিয়ে। বিনয় বলছিল, ও কোথা থেকে শুনে এসেছে।

ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন, কি বলছ? তুমি কি বলছ? শান্তি ডাক্তার হয়েছে? হায়, ভগবান, তুমি আমার ডাক শুনেছ, তুমি আমার অন্তরের কামনা পূর্ণ করলে, আমায় শান্তিতে মরতে দিলে, আর দুঃখ নেই, কোন দুঃখ নেই। আমার স্নেহের গচ্ছিত ধন, আজ তার বাপ-মার মুখ রেখেছে। তাঁদের মুখ রেখেছে নিজেকে বলি দিয়ে। চাইবেন না ভগবান, দেখতে পাচ্ছেন না তিনি? মানুষের গড়া আইনকে ফাঁকি দিতে পার, কিন্তু সেখানে সূক্ষ্ম বিচার—ফাঁকি নেই, ভেজাল সেখানে চলবে না।

শান্তি চেম্বারে ব'সে ঘন্টি বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকলে, বললে, বাহার-মে খাড়া রও। একজনকে ডেকে বললে, তোমার কি হয়েছে? এদিকে এস। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় বিন্দু। বুকে যন্ত্র বসিয়ে দেখে শান্তি, চোখের পাতা তুলে দেখে রক্তের অভাব। নাড়ী টেপে, ভার ভার ঠেকে।

শান্তি, মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কপালে সিঁদুর নেই, অথচ—। ব্যাপার কি বল তো? সঙ্গে কে আছে?

কেউ নেই, আমায় এই অবস্থায় ফেলে পালিয়েছে, সাত দিন হ'ল দেখা নেই। লজ্জায় মুখ নীচু ক'রে ব'সে থাকে বিন্দু।

শান্তি বললে, এই লিখে দিলাম ট্যাবলেট, দিনে তিনটে ক'রে খাবে, তিন দিন পরে দেখা করবে।

আটটা টাকা দিতে গেল বিন্দু শান্তির হাতে।

শান্তি বললে, এই যে বললে, কেউ নেই। টাকা কোথা পেলে?

হাতে এক জোড়া বালা ছিল মায়ের দেওয়া, কোন উপায় করতে না পেরে বিক্রি ক'রে আপনার কাছে এসেছি।

ওটা রেখে দাও, কোন দরকারী কাজে লাগিও।

ঘণ্টি বাজল। সামনে তন্বী তরুণী, মুখে সর পড়েছে জল-ছবির কাগজের মত। কালো গগল্‌স্ প'রে মুখ ঢেকে এসেছে।

শান্তি বললে, কি হয়েছে?

সামনের চেয়ারে ব'সে পঙ্কজিনী বললে, আমি ছয় সাত মাস ভুগছি, কিছুই ঠিকমত হচ্ছে না, তাই আপনার কাছে এসেছি।

হাত দেখে, বুক দেখে, লক্ষণ নির্ণয় ক'রে শান্তি বললে, হ্যাঁ, তারপর? কি করতে চান?

পঙ্কজিনী বললে, আমি এটা—

থাক্, আর বলতে হবে না।. আমি এ কেস নিই না। যখন নিজেকে ডুবিয়েছিলে প্রেমের সাগরে তখন ভাব নি—পুত্রের জননী হতে হবে, লালন পালন ক'রে বাঁচাতে হবে শিশুকে? তোমার মা যদি সমভাবাপন্ন হ'ত তা হ'লে তুমি পৃথিবী দেখতে কোথা থেকে? আর গোপনে নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ ই বা কি? আমার এখানে ওসবের কোন ব্যবস্থাই নেই।

পঙ্কজিনী হাতের ব্যাগ থেকে আট টাকা বার ক'রে দিলে।

শান্তি বললে, আমার ভিজিট জানেন না? বাড়িতে ষোল টাকা আর—

পঙ্কজিনী আর আট টাকা দিয়ে, ক্ষুদ্র নমস্কার ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

হাসপাতালের ঘরে, যারা লাইন দিয়ে ব'সে রক্ত দিচ্ছে তাদের মধ্যে বিনয় একজন। রক্ত দিয়ে টাকা নিয়ে বাবার চিকিৎসা করাবে। ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বিনয় বললে, ডাক্তারবাবু, আমারটা—

ডাক্তারবাবু মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, পর পর নিতে হবে, ব্যস্ত হ'লে চলবে না। দেখছেন না, কত লোক আপনার আগে আছে?

শেখর ডাক্তার ঘড়ি দেখে, বারোটা বাজতে কত দেরি আছে। ফাইলের পাতা পর পর উল্টে যায়।

ডাক্তারবাবু বিনয়কে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন, দেখুন তো এর স্বাস্থ্যটা ? আমি একশো সি. সি.র বেশী রক্ত নিতে পারব না, উনি বলছেন আড়াইশো সি. সি. নিতে।

কি করব ডাক্তারবাবু, আমার যে আজ পঞ্চাশ টাকা চাই।

শেখর ডাক্তার দেখে বললেন, আজ আর নয়, পাঁচ দিন পরে ফের এস। পার তো একটু দুধ খেও, নিজেকে বাঁচাতে হবে তো। আর কয়েক জন মাত্র আছে। তুমি সেরে নিও ডাক্তার, আমি চললাম। উঠে দাঁড়াল, বিনয়ের মুখের দিকে চেয়ে চ'লে গেল।

ডাক্তার বললে, আপনি এই রোগা শরীরে রক্ত দিতে এসেছেন ?

বিনয় বললে, কি করি বলুন ? কোন প্রকারে টাকার সংস্থান করতে না পেরে, এখানে এসেছি। টাকার অভাবে বাবার চিকিৎসা হচ্ছে না, একটু তাড়াতাড়ি ক'রে নিন ডাক্তারবাবু।

শান্তি ঘন্টি বাজিয়ে ডাকলে অন্য রোগীকে। ব'স, তোমার নাম কি?

কুমুদিনী।

শান্তি যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা ক'রে, একবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, উনি কে?

দূরসম্পর্কের মাসি।

তোমার হয়েছে কি?

এই খেতে পারি না, পেটটা ব্যথা করে, মাথা ঝিম ঝিম করে, গা বমি বমি করে। আপনার দয়ার কথা, পাড়ার লোকের কাছে শুনে তাই ছুটে এসেছি।

কুমুদিনীর মাসি চেয়ে ছিল শান্তির মুখের দিকে, অনেকক্ষণ পরে বললেন, আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

কি বলবেন বলুন।—ব'লে খসখস ক'রে লিখতে লাগল শান্তি।

সতীশ পাশের ঘরে ব'সে মাসিক বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। আর গল্প করছে বন্ধুর সঙ্গে।

কুমুর মাসি বললেন, আচ্ছা, আপনাকে চেনা-চেনা ঠেকছে, রামহরি ভট্টাচার্য্যের কেউ হবেন কি?

আপনি তাঁকে চেনেন না কি? কেমন আছেন তিনি? থাকেন কোথায়?

কুমুর মাসি বললেন, বাগবাজারের কাছে একটা বাড়িতে। অবস্থা খুবই খারাপ—যত দূর হতে হয়। ছোট ছেলেটা বাপ মাকে আঁকড়ে প'ড়ে আছে। পয়সার অভাবে চিকিৎসে হচ্ছে না, বোধ হয় আর বাঁচবেন না ভট্টাচার্য্য মশাই।

শান্তি যন্ত্র ফেলে উঠে পড়ল। বাবা মৃত্যুশয্যায়? হেঁকে বললে, বেয়ারা, ওঁকে ডাক তো। সতীশকে বললে, তুমি কিছু ভাল ফল কিনে নিয়ে এস, আমায় এক্ষণি যেতে হবে বাবার কাছে।

রাজলক্ষ্মীকে ভট্টাচার্য্য মশাই বললেন, শান্তির খোঁজ খবর কিছু পেলে? আর যে বাঁচি না। তার সঙ্গে দেখা না হ'লে আমি যে ঋণী থেকে যাব। ম'রে তৃপ্তি পাবে না আত্মা।—যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন তিনি।

তুমি একটু চুপ ক'রে থাক, সুস্থ হবে। বিনয় এল ব'লে।

কাদের শব্দ শোনা গেল ঘরের বাইরে! ডাক্তার পথ্য সঙ্গে সতীশকে নিয়ে এসেছে।

সতীশকে সঙ্গে ক'রে শান্তি ঘরে এসে ঢুকল। শান্তিকে দেখে বুকে টেনে নিলেন ভট্টাচার্য্য মশাই। আনন্দে অশ্রু বর্ষিত হতে লাগল। বুক ভেসে গেল চোখের জলে।

অনেক অনুরোধ উপরোধ ক'রে হাসপাতালের ডাক্তারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এল বিনয়। ঘরে ঢুকে দেখা হয়ে গেল সকলের সঙ্গে।

শেখর ডাক্তার বললেন, তুমি না একটু আগে রক্ত বিক্রি ক'রে এলে হাসপাতালে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পিতার চিকিৎসার টাকার অভাবে।

শান্তি আশ্চর্য্য হয়ে গেল বিনয়ের পিতৃভক্তি দেখে।

ডাক্তারবাবু পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে লাগলেন বিনয়ের।

রাজলক্ষ্মী শান্তির হাত দুটো ধ'রে বললেন, তোর ওপর কত অন্যায় অত্যাচার করেছি—

কি বলছ মা ! ও তুমি কি বলছ ? ডাক্তারবাবু, কেমন দেখলেন ? তুমি দাঁড়িয়ে রইলে ? মাকে ফলগুলো দিয়ে দাও। বাবা, আপনি ভাল হয়ে যাবেন, ডাক্তারবাবু বললেন।

রামহরি ভট্টাচার্য্য উঠে ব'সে বললেন, আমার রোগ সেরে গেছে, আমি ভাল হয়ে গেছি মা, আমার পাপের লাঘব করেছে, আমার হারানো শান্তি ফিরে পেয়েছি। মা আমার অন্নপূর্ণা। বুকে জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে।

শান্তি মুখ লুকোয় বাবার বুকের মধ্যে।

॥ সমাপ্ত ॥